ন্যায়মতে আত্মার স্বরূপ- একটি দার্শনিক পর্য্যালোচনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এম.ফিল. পাঠক্রমের
আংশিক পরিপূর্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা নিবন্ধ

বর্ষঃ ২০১৫-২০১৭

সুতপা দাস

ক্রমিক নং : 92 /PHI/164003

রেজি. নং : 0027187 OF 2008-2009

দর্শন বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৮

Dr Uma Chattopadhyay
Retired Professor of Philosophy,
Department of Philosophy,
University of Calcutta,
Alipore Campus, Second Floor,
1 Reformatory Street,
Kolkata - 700 027.

Residence:
"Krishnachura",
26A/1B, Jhil Road,
Flat 3A (Second Floor),
Kolkata-700 031,
Telephone: (+9133) 2472-3238(R),
E-mails: uccal55@gmail.com
Mobile: 9830210824

Date: 22.03.2018

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that this dissertation entitled "*Nyayamate Atmar Svarup- ekti Darsanik Paryalochana*" (in Bengali) has been written by Smt. Sutapa Das, Registration No. 0027187 of 2008-2009 and Roll No. 92/PHI/164003 under my supervision during the session 2015-17 for obtaining M.Phil Degree in Philosophy from University of Calcutta.

Uma Chattopadhyay
28.3.18

Uma Chattopadhyay,
Retired Professor of Philosophy,
Department of Philosophy,
University of Calcutta.

PROFESSOR (R)
Department of Philosophy
University of Calcutta
Alipore Campus
1, Reformatory Street, Kolkata-27

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার নিবন্ধ পত্রের মূল বিষয় “ন্যায় মতে আত্মার স্বরূপ- একটি দার্শনিক পর্য্যালোচনা।” এই নিবন্ধ পত্রের সম্পূর্ণ আলোচনা আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা উমা চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে থেকে সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছি। তিনি তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে আমাকে আমার বিষয় সম্বন্ধে পড়িয়েছেন, বুঝিয়েছেন। ঠিক কীভাবে নিজেকে তৈরী করলে আমি আমার লক্ষ্যে উপনীত হব তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেছেন। তাই তাঁর প্রতি আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এর সাথে দর্শন বিভাগের সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের প্রতি সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া কেন্দ্রীয় ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমাকে বিভিন্ন পুস্তকের সন্ধান দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। তার সাথে আমি আমার পরিবারের সকলের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমি আমার মা- বাবা, শশুড়- শাশুড়ি, এবং স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের সহযোগিতা ছাড়া আমি আমার কার্য কখনই সম্পাদন করতে পারতাম না। এছাড়া আমার সকল সহপাঠী ও বড় দাদা- দিদি যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমাকে সাহায্য করেছে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিনীত,

দর্শন বিভাগ, কলকাতা- ৭০০০২৭ সুতপা দাস

সূচীপত্র

ভূমিকা	১-৮
প্রথম অধ্যায় আত্মা চৈতন্য বিশিষ্ট	৯-৩০
দ্বিতীয় অধ্যায় চৈতন্য স্বরূপ আত্মা	৩১-৫৩
তৃতীয় আধ্যায় ন্যায় মত স্বীকৃত আত্মার স্বরূপ	৫৪-৬৯
উপসংহার	৭০
গ্রন্থপঞ্জী	৭১-৭৪

ভূমিকা

সাধারণভাবে দর্শনে একটি আলোচনার বিষয় হল আত্মা। প্রাচ্য বিশেষতঃ ভারতীয় ও পাশ্চাত্যে এ বিষয়ে মূল প্রভেদ হল প্রাচ্যে অর্থাৎ ভারতীয় দর্শনে আমরা আত্মাকে মন থেকে স্বতন্ত্ররূপে স্বীকার করি কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনে মন ও আত্মাকে একই অর্থে গ্রহণ করা হয়। এবং ভারতীয় দর্শনে আত্মার বিষয়ে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের ব্যাপক ও গভীর আলোচনা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল ভারতীয় দর্শনে বিশেষ করে কেন আত্মতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা ? চরম নাস্তিক চার্বাক থেকে শুরু করে বেদান্ত দর্শন পর্যন্ত সকল ভারতীয় দর্শনেই আত্মা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই আত্মা কেন স্বীকার্য ? এবং আত্মা কেন স্বীকার্য এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি আত্মা হল সমগ্র ব্যবহারের কেন্দ্রবিন্দু। সমগ্র ব্যবহার সমগ্র চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হল আত্মা। কারণ আত্মা যদি স্বীকৃত না হয় তাহলে কোনো শাস্ত্রেরই তাৎপর্য থাকে না। দর্শন শাস্ত্র তথা বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি অন্যান্য সকল শাস্ত্রই আত্মার প্রয়োজন সাধনের জন্যই রচিত। ঠিক যেমন সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা প্রভৃতি রচনা করা হয় আত্মা বা কর্তা আনন্দ পাবে বলে। সুতরাং আত্মা ব্যতীত কোনো কিছুরই কোনো তাৎপর্য নেই। অতএব, আত্মা স্বীকার না করলে জগৎ অন্ধকার হয়ে যাবে বা জগদান্ধত্ব প্রসঙ্গ এসে যায়। সুতরাং আত্মা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং আত্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা থাকে। সেই সঙ্গে আত্মার স্বরূপ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ও প্রয়োজন।

আত্মাকে কি সত্যিই নতুন করে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে? কারণ- আত্মা ত প্রতিষ্ঠিত আছে। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আত্মা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে? উত্তরে বলা যায় ‘অহং’ বা ‘আমি’-এই বোধ আমাদের সকলের

আছে। ‘আমি এই কাজ করছি’, ‘আমি শয়ন করছি’ ইত্যাদি সকল কিছুর মধ্যে আমি বলে যে বোধটা হয় সেই বোধের বিষয় যে ‘আমি’ সেই আমি কর্তা বা আত্মা বলতে পারি অর্থাৎ ‘অহং’ প্রতীতির বিষয় রূপে আত্মা স্বীকার্য। ঠিক যেমন- আমরা বলি ‘এটি ঘট’ তখন বোঝা যায় ‘ঘট’ নামক বস্তু আছে, তেমন আমি যদি বলি ‘অহং সুখী’ তখন ‘অহং’ ও ‘সুখ’ দুটি পৃথক পদার্থ কে বোঝায়। ‘অহং’ বলতে এই স্থলে কর্তাকে বোঝায়। এই কর্তাই আত্মা। সুতরাং অহং প্রতীতির বিষয় রূপে আত্মা সর্বজনসিদ্ধ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যদি আত্মা সর্বজনসিদ্ধ পদার্থই হয় তাহলে আমি বিশেষ করে কেন এই আত্মার আলোচনায় আগ্রহী? বা নতুন করে এই আলোচনার তাৎপর্য কী থাকতে পারে? উত্তরে বলা যায় ‘অহং’ প্রতীতির বিষয় রূপে যে ‘আমি’ বা ‘আত্মার’ বোধ আমাদের হয় তা আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে এই ‘আমি’ টি কে ? আমি কি কেবল এই দেহ, এই ইন্দ্রিয় নাকি তৎ ভিন্ন কিছু ? কারণ- ‘অহং’ শব্দের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই না। তাহলে আত্মার স্বরূপটা জানা প্রয়োজন। কেননা, এই স্বরূপ জানাতেই আমাদের ভেদ বুদ্ধি; নানাবিধ বিরুদ্ধ চিন্তা সেখানে কাজ করে। আত্মার স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচিত হয়েছে। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকে আত্মা বলা হয়েছে এমন দর্শনও ভারতবর্ষের দর্শনের প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই, আবার কোনো কোনো দর্শন সম্প্রদায় চৈতন্য বা বিজ্ঞান প্রবাহ মাএকে আত্মা বলেছেন। কিন্তু আমার এখানে আলোচনার বিষয় হল কীভাবে ন্যায় বৈশেষিকগণ আত্মাকে প্রতিপাদন করেছেন।

ন্যায় দর্শনে আত্মার যে প্রয়োজনীয়তা সেই প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি যে, আত্মা হল কর্তা; এই কর্তা বা আত্মাই সুখ, দুঃখ ভোগ করেন, ফলে দুঃখ মুক্তির জন্যই কর্তা প্রয়াসী হন। আত্মার মুক্তির জন্যই দর্শন। তাই এই দর্শনে মুখ্য প্রমেয় বলতে আত্মা ও অপবর্গকেই মনে করা হয়েছে। আত্মা অপবর্গ লাভ করবে; আত্মা না থাকলে অপবর্গের প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং মূলে হল আত্মা। তাই সূত্রকার মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থে যখন প্রমেয়ের উল্লেখ করেছেন তখন তিনি সর্বপ্রথম আত্মার উল্লেখ করেছেন।–

"আত্ম- শরীরেন্দ্রিয়ার্থ- বুদ্ধি- মনঃ – প্রবৃত্তি-

দোষ- প্রেত্যভাব- ফল- দুঃখাপবর্গাস্ত প্রমেয়ম্"। ন্যা.সূ: ১/১/৯

এখন প্রশ্ন হল এই আত্মার স্বরূপ কী? আত্মার যে স্বরূপ আমরা অহং বুদ্ধির বিষয়রূপে পাই সেই স্বরূপ তো যথার্থ স্বরূপ নয়। সেখানে আমাদের শাস্ত্রের তত্ত্বকে বুঝতে হয়। যে কোনও পদার্থ সিদ্ধির জন্য লক্ষণ প্রয়োজন। শাস্ত্রে তাই বলা হয়- 'লক্ষণ প্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ' মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থের দশম সূত্রে জীবাত্মার অনুমাপক বা সাধক লিঙ্গ বা হেতুর উল্লেখ করেছেন।

এখানে ১/১/১০ সূত্রে "লিঙ্গ" শব্দের অর্থ লক্ষণ, অনুমাপক ও বটে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলেন, ইচ্ছাবত্ত্ব ও দ্বেষবত্ত্ব প্রভৃতি আত্মার লক্ষণ, এটা সূত্রের অর্থ। তারমধ্যে ইচ্ছাবত্ত্ব, প্রযত্নবত্ত্ব ও জ্ঞানবত্ত্ব এই তিনটি জীবাত্মার ও পরমাত্মা এই দ্বিবিধ আত্মারই সামান্য লক্ষণ। কারণ, ঈশ্বরেরও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন ও নিত্যজ্ঞান আছে। কিন্তু দ্বেষবত্ত্ব ও দুঃখবত্ত্ব কেবল জীবাত্মারই লক্ষণ।

কারণ পরমেশ্বরের সুখ, দুঃখ, দ্বেষ নেই। বিশ্বনাথ তাঁর "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"তে পরে পরমেশ্বরের নিত্যসুখ ও স্বীকার করেছেন। জয়ন্তভট্ট ও তা সমর্থন করেছেন। তাহলে সুখবত্ত্ব পরমাত্মারও লক্ষণ বলা যায়।

"ইচ্ছা- দ্বেষ- প্রযত্ন- সুখ- দুঃখ- জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্।।" ন্যা.সূ: ১/১/১০

অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ দেহাদিভিন্ন চিরস্থায়ী জীবাত্মার অনুমাপক।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানকে চিরস্থায়ী নিত্য আত্মার লিঙ্গ বলে ব্যাখ্যা করে প্রথমে বলেছেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজন্য যে জাতীয় পদার্থের দর্শন করে কোন আত্মা পূর্বে সুখের উপলব্ধি করে, পরে সেই জাতীয় পদার্থকে দর্শন করলে সেই আত্মারই তা গ্রহণ করার নিমিত্ত ইচ্ছা জন্মায়। সেই যে গ্রহণ করার নিমিত্ত ইচ্ছা তার দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে, সেই প্রথম দ্রষ্টা ও পরে ইচ্ছার কর্তা আত্মা এক। কারণ- পরে প্রত্যভিজ্ঞারূপ মানস প্রত্যক্ষ জন্মায়। আত্মা যদি এক না হয় তাহলে প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান হতে পারে না। কিন্তু এখানে 'যে আমি পূর্বে এই জাতীয় পদার্থকে দর্শন করে সুখের উপলব্ধি করেছিলাম, সেই আমিই এখন এটা দর্শন করে গ্রহণ করার নিমিত্ত ইচ্ছা করছি'- এরূপ মানস প্রত্যক্ষরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ায় তার দ্বারা সেই ইচ্ছা পূর্বপরকাল স্থায়ী আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়।

ভাষ্যকার পরে দুঃখজনক পদার্থে আত্মার দ্বেষ এবং সুখজনক ও দুঃখজনক পদার্থে প্রযত্ন সুখ ও দুঃখ কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসার পরে সংশয় ও পরে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানও যে, পূর্বোক্তরূপ চিরস্থায়ী আত্মার লিঙ্গ হয়, এর ব্যাখ্যা করে পরে বলেছেন যে- "পূর্বোক্ত এব হেতুঃ"। অর্থাৎ যে আমি পূর্বে সেই

পদার্থকে দর্শন করে দুঃখের অনুভব করেছিলাম, সেই আমি সেই জাতীয় পদার্থকে দর্শন করে দ্বেষ করছি- ইত্যাদিরূপে সেই আত্মার যে প্রত্যভিজ্ঞা জন্মায়, তার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, সেই আত্মা পূর্বপরকাল স্থায়ী এক। কারণ- একের অনুভূত বিষয় অন্য ব্যক্তি বা আত্মা স্মরণ করতে পারে না। স্মরণ ব্যতীত প্রত্যভিজ্ঞা ও হতে পারে না।

সমানতন্ত্র বৈশেষিক দর্শনেও আত্মার স্বরূপ নির্ধারণ করতে সূত্রকার কণাদ বলেছেন-

"আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোদযন্নিষ্পদ্যতে তদন্যৎ"। বৈ.সূ. ৩/১/১৮

এইরূপে জ্ঞানকে জীবাত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ লক্ষণ রূপে স্বীকার করেছেন। পরে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে চতুর্থ সূত্রে বলেছেন-

প্রাণাপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ

সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চাত্মানো লিঙ্গানি।। বৈ.সূ. ৩/২/৪

কেবলমাএ জ্ঞান বা সাক্ষাৎকারই যে আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক তা নয়, প্রাণক্রিয়াদিকেও আত্মার অনুমাপক বলতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রাণবায়ুর ক্রিয়া; মলত্যাগাদি-আপন বায়ুর ক্রিয়া; এই সকল ক্রিয়া যার প্রযত্নে সম্পন্ন হয়, তাকেই আত্মা বলে। সর্বদা দেখা যায় যে, বায়ু যে সময় নিজে প্রবাহিত হয়, তৎকালে বক্রভাবেই প্রবাহিত হয়; কিন্তু যখন তালবৃন্তসঞ্চালন করা যায়, তখন বায়ু উর্দ্ধ বা অধোদিকেও প্রবাহিত হয়; এটা যত্নসাপেক্ষ; কাজেই প্রাণক্রিয়াদিস্থলেও এই যে বায়ুর অনৈসর্গিক গতি, তাও যত্নসাপেক্ষ; সেই যত্নবিশিষ্ট পদার্থই আত্মা। কর্ম বহুবিধ; কোনো কোনো কর্মের করণ হল সংযোগ বিশেষ। যেমন- বৃক্ষাদির

কম্পন, বায়ুর সংযোগ ঘটলেই বৃক্ষাদিতে কম্পন হয়। আবার কখন কখন দেখা যায় যে কর্মের উৎপত্তি হয় প্রযত্ন জন্য। যেমন- কোনো ব্যক্তি অফিস থেকে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল মানিব্যাগটা অফিসেই ফেলে এসেছেন তখন তিনি তড়িৎ গতিতে অফিসের দিকে ছুটলেন। এখানে ব্যক্তিটির তড়িৎ গতিতে দৌড়ানোর কারণ হল প্রযত্ন। ঠিক তেমন চোখের পাতার খোলা বন্ধ হওয়ার পেছনেও থাকে প্রযত্ন। যিনি প্রযত্নবান তিনিই আত্মা। যার অস্তিত্বে ক্ষতস্থান পূরণ হয় তাই আত্মা। কোন স্থান ক্ষত হলে কয়েকদিনের মধ্যেই তা আবার পূরণ হয়ে ওঠে, এটাই জীবাত্মার লক্ষণ। যাতে আত্মার সম্বন্ধ আছে তাকেই জীবিত বলে। কাজেই ক্ষতপূরণাদিকেও আত্মার অস্তিত্বের অনুমাপক বলতে হবে। যাঁর প্রেরণায় মন কোন একটি বিষয়ে মননিবেশ করতে পারে তাই আত্মা। এভাবে সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্নের যিনি আশ্রয় তাকেই চিরস্থায়ী আত্মা বলা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বলা প্রয়োজন তাহল ‘পরমত অপ্রতিসিদ্ধম্ অনুমতম্’ অর্থাৎ অন্যমত অস্বীকার করে খন্ডন করে তবেই নিজমত প্রতিষ্ঠা করা যায়। সুতরাং আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে ন্যায় বৈশেষিক মত আমার মুখ্য আলোচনার বিষয় হলেও আমাদের দেখতে হবে পরমতগুলি কী কী? তদ্অনুসারে প্রত্যেকটি মতকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং খন্ডন সম্ভব হলে তা করতে হবে।

আত্মার এই স্বরূপকে বুঝতে হলে দুভাবে বুঝতে পারি। প্রথমত, নাস্তিক ও আস্তিক দর্শন ভেদে পর পর আলোচনা আবার একজাতীয় দর্শনকে একভাবে বুঝে ভিন্ন জাতীয় দর্শনকে ভিন্ন ভাবে বুঝে তারা কি বলেছেন সেটা বুঝে নিতে পারি। এখানে আমরা আলোচনা করছি যারা আত্মাকে কোনো না

কোনো পদার্থ বলেছেন তাদেরকে অর্থাৎ চার্বাক, জৈন, মীমাংসা সম্প্রদায়কে একজাতীয় সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত করে এবং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ, সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন যারা বিজ্ঞান বা চৈতন্য মাএ- কে আত্মা বলেছেন তাদেরকে অপর একটি সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত করে। এই দুই এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন ন্যায় বৈশেষিকরা। তদ্অনুসারে ন্যায় বৈশেষিক মতবাদ একটি পৃথক অধ্যায় করেছি।

ন্যায় বৈশেষিক মতে, আত্মা জ্ঞানের অধিকরণ হলেও, আত্মায় সর্বদা জ্ঞান থাকে না। আত্মা পূর্বকৃত কর্মবশত দেহের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হলে, আত্মায় জ্ঞান- গুণ উৎপন্ন হয় না। কর্মফল ভোগ শেষ হয়ে গেলে, আত্মা যখন দেহ মুক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ চরম মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করে তখন আত্মা একখন্ড পাথরের মতই জ্ঞানহীন। জড়দ্রব্য যেমন স্বরূপত অচেতন, তেমনি আত্মাও স্বরূপত অচেতন। তবে, জড়দ্রব্যের সাথে আত্মার পার্থক্য রয়েছে তাহল আত্মা অবস্থা বিশেষে জ্ঞান গুণের আধার হয় কিন্তু টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি জড়দ্রব্য তা কখনই হতে পারে না।

তবে আপত্তি হতে পারে এই জাতীয় আত্মার মুক্তি তাহলে কিসে যে মুক্তিতে তার সুখ দুঃখ কিছুই থাকবে না। কারণ শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রের তাৎপর্যতো সেখানেই। কিন্তু ন্যায় মতে, মুক্তির অবস্থায় মুক্ত জীবের কোনো সুখ ভোগ হয় না, তার কোনো চৈতন্যই থাকে না। আত্মা জড় দ্রব্যবৎ অবস্থা মাএ। এই যে মুক্তি তা তো কাঙ্খিত হতে পারে না। কারণ- যা জড়ের অবস্থা তা কি করে কাঙ্খিত হতে পারে। এখানে মহর্ষি গৌতম, গঙ্গেশের উত্তরও রয়েছে। যখন কেউ কষ্টের মধ্যে থাকে তখন কষ্ট রাহিত্যটাই তার কাছে কাম্য থাকে, অতিব সুখের

কথা তখন সে চিন্তা করে না, শুধু কষ্ট নিবৃত্তিটাই কাম্য- এবং সেটা অত্যন্ত বাস্তব, তাই নৈয়ায়িকদের যে সিদ্ধান্ত আত্মার সঙ্গে মুক্তির প্রসঙ্গে সেটাও অত্যন্ত বাস্তব। সেই মুক্তির জন্যই এভাবে আত্মার স্বরূপকে বুঝলেও কোনো অসুবিধা হয় না। তদনুসারে এই প্রবন্ধে ন্যায় বৈশেষিক সম্মত আত্মার স্বরূপ কিভাবে অন্য দর্শনের ভাবনা থেকে ভিন্ন তা দেখাব এবং সেই আত্মার যে মুক্তির স্বরূপ কি হবে সেটিও উল্লেখ করব।

আলোচনার সুবিধার্থে আমি নিম্নোক্ত ভাবে বিষয়ের বিন্যাস করেছি। প্রথম অধ্যায় আত্মা চৈতন্য বিশিষ্ট। এখানে আলোচনা করেছি চার্বাক, জৈন ও মীমাংসা সম্প্রদায়ের আত্মা সম্পর্কীয় অভিমত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী, সাংখ্য ও বেদান্ত সম্প্রদায়ের অভিমত, যার শিরণাম চৈতন্য স্বরূপ আত্মা। এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অভিমত আলোচনা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

আত্মা চৈতন্য বিশিষ্ট

ন্যায় দর্শনে আত্মার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা তত্ত্বালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলেও, সেই আত্মার স্বরূপ প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বপক্ষীদের মতগুলির উল্লেখ ও খন্ডন আবশ্যক। এই অভিপ্রায়েই পূর্বপক্ষী অভিমতকে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব চার্বাক, জৈন ও মীমাংসা সম্প্রদায়ের আত্মা সম্পর্কীত অভিমত যাঁরা আত্মাকে একটি বিশেষ সত্তারূপে স্বীকার করেছেন। দার্শনিকরা সেই পদার্থের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্বীকার করলেও তাঁরা চৈতন্য মাত্র বা বিজ্ঞান প্রবাহকে আত্মারূপে স্বীকার করেননি। সেই সকল মতানুযায়ী আত্মা চৈতন্য ভিন্ন। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে আমরা চার্বাক সম্প্রদায়ের মতটি আলোচনা করব।

আত্মা সম্পর্কিত চার্বাক অভিমত

সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের ন্যায় চার্বাকরাও আত্মা স্বীকার করেন কিন্তু দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা। চার্বাকরা প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী। তাঁদের মতে, চৈতন্যর আধাররূপে কোন আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং ঐরূপ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা অযৌক্তিক। আধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দার্শনিকদের মতে আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থেকে ভিন্ন এক স্বতন্ত্র সত্তা। আত্মা দেহে আশ্রিত হলেও দেহ থেকে ভিন্ন এক সত্তা। দেহ জড় কিন্তু আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এক অজড় বা চেতন সত্তা। দেহ অনিত্য হলেও আত্মা নিত্য । আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। শরীর বিনষ্ট

হলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না ('ন হন্যতে হন্য মানে শরীরে') বৌদ্ধ ও চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শনে আত্মাকে নিত্য, শাশ্বত সত্তা বলা হয়েছে।

চার্বাকরা এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ - এই চতুর্ভূত সব বস্তুর মূল উপাদান। চতুর্ভূত তাঁদের স্বভাব বশতই কিংবা যদৃচ্ছ মিলিত হয়। এই চতুর্ভূতের সংমিশ্রনে যখন দেহ উৎপন্ন হয় তখন চৈতন্যের ও উৎপত্তি হয়। এই চৈতন্য দেহেরই ধর্ম, আত্মার ধর্ম নয়। চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা। তবে একথা ঠিক যে, জগত তথা মনুষ্যদেহের মূল উপাদান এই চারটি ভূতে পৃথকভাবে চৈতন্য দেখা যায় না; কিন্তু যেমন –পান, চুন কিংবা খয়ের কোনটাই পৃথক ভাবে লাল না হলেও এদের একত্রে মিশালে লালবর্ণের উৎপত্তি হয়, যেমন সুরাসমুৎপাদক দ্রব্যচয় সমবেত হলে মাদকতা শক্তির উৎপত্তি হয় সেই রকম চতুর্ভূতের সংমিশ্রণে দেহে চৈতন্য গুণের উৎপত্তি হয়। চার্বাক মতে, এই চৈতন্য দেহে থাকে এবং জীব দেহেই এর প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং এই চৈতন্য যুক্ত দেহই আত্মা। চৈতন্য দেহে থাকে তাই তা দেহেরই ধর্ম। তাই এই মতবাদ দেহাত্মবাদ। দেহাতিরিক্ত আত্মা কোন স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেখানেই চৈতেন্যের অনুভব সেখানেই তা দেহের অন্তর্গত। সুতরাং মৃত্যুকালে যখন উক্ত চারি ভূতের বিয়োগ ঘটবে তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হবে। পর্যবেক্ষণ ও ভুয়োদর্শনের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে, চৈতন্যের উৎপত্তির জন্য দেহের অপেক্ষা অস্বীকার করা যায় না। যেখানে চৈতন্য আছে, সেখানেই দেহ আছে। দেহের নিয়ত পূর্ববর্তিত্বের ব্যভিচার নেই। আবার যেখানে দেহ নেই সেখানে চৈতন্য ও নেই। এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহায্যে বুঝতে পারা যায় যে, দেহ ও চৈতন্যের মধ্যে, (প্রতিবাদি সম্মত) কার্যকারণ ভাবরূপ

একটি সম্বন্ধ রয়েছে। আমি উষ্ণ অনুভব করছি, ক্লান্ত অনুভব করছি প্রভৃতি বাক্যে প্রকাশিত অনুভব ও এই মতের পরিপোষক। দেহের বিনাশে চৈতন্যের অবস্থিতি অসম্ভব। দীপশিখা, বাতি তেলের পরিণাম মাত্র। বাতি ও তেলের সংযোগে যেমন দীপশিখার আবির্ভাব হয়, সেই রকম ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। একটি প্রদীপের আগুন ও আলোর মধ্যে আগুন যতক্ষণ থাকে, আলো ও ততক্ষণ থাকে; যে মুহূর্তে আগুন নির্বাপিত হয়, আলো ও সেই মুহূর্তেই অন্তর্হিত হয়। ঠিক তেমনই যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণই তাতে প্রাণশক্তি থাকে চৈতন্য বা যা কিছু তথাকথিত আত্মার ধর্ম বলে সকলে বলে থাকেন সেগুলি থাকে, দেহ বিনষ্ট হলে সেই সমস্তই অন্তর্হিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে চৈতন্য দেহের গুণ বা ধর্ম এবং দেহাভ্যন্তরেই বিদ্যমান থাকে; দেহের বাইরে চৈতন্যের কোন অস্তিত্ব নেই।

যখন কেউ বলেন আমি স্থূল,আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি সুস্থ ইত্যাদি- তখন সে দেহ থেকে আমিকে, আত্মাকে ভিন্ন জ্ঞান করে না। একথা ঠিক যে, ‘আমার দেহ’ এই কথার প্রয়োগ আমার করে থাকি কিন্তু এটি উপচারিক প্রয়োগ। যেমন - রাহুর মস্তক এবং রাহু অভিন্ন হলেও কথার কৌশলে এদের ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয় ঠিক তেমনই ‘আমার দেহ’ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা আমাদের মনে হতে পারে দেহ ও আত্মা ভিন্ন কিন্তু এটি আসলে ঠিক নয়। কারণ– আমরা যেমন ‘আমার দেহ’ এইরূপ প্রয়োগ করি, তেমনই ‘আমার আত্মা’ একথাও বলে থাকি। যদি ‘আমার দেহ’ এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা আত্মাকে আমি বলতে হয়, তবে ‘আমার আত্মা’ এরূপ প্রয়োগ দেখে ‘আমি’ কে আত্মা থেকে পৃথক দেহই বলতে হবে। সুতরাং দেহই

আত্মা এটাই স্বীকার করা শ্রেয়। তাই চার্বাক মতে দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ নেই।

বৌদ্ধগণের মত চার্বাকগণও সাধারণত, আকাশের ভূতত্ত্ব স্বীকার করেন না। আকাশ শূণ্য; আবরণের অভাব মাত্র। অবশ্য- 'কেচিৎ চার্বাকৈক দেশীয়া আকাশমপি পঞ্চমং ভূতং মন্যন্তে' (তর্করহস্য দীপিকা, গুণরত্ন)- চার্বাকগণের একটি শাখা আকাশকে পঞ্চম ভূতরূপে স্বীকার করেন। পরিদৃশ্যমান যান্ত্রিক স্থূল জগৎ, পরিদৃশ্যমান স্থূল মনুষ্যদেহ, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ ও মন – সকলই এই জড়স্বভাব ভূতচতুষ্টয় বা ভূতপঞ্চকের কার্য। দৃষ্ট বা অদৃষ্ট সকল প্রকার কার্যকারণভাব ও সকল দ্রব্য অচেতন ভূতগণের সক্ষ্ম অণুসমূহের আকস্মিক মিলনেই উৎপন্ন। চার্বাক মতে প্রাণশক্তি এবং চৈতন্য এক। এটা অচেতন জড় পদার্থ থেকেই উৎপন্ন। চৈতন্য ও মানস জগতের বিচিত্রানুভূতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোন একটি পৃথক জড় অতিরিক্ত মৌলিক পদার্থ স্বীকার করার কোন আবশ্যকতা নেই। এটা সত্য যে, ভূতচতুষ্টয়ের কোনটিরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অচেতন পরমাণুতে পৃথক বা সমষ্টিগত ভাবে, সহজাতরূপে, চৈতন্যকে পাওয়া যায় না। যখন এই সকল পরমাণুকে কোন নির্দিষ্ট আকারে শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজান হয়, তখনই তাতে জীবনীশক্তি বা চৈতণ্যের আর্বিভাব ঘটে। পরমাণুর এই বিন্যাস থেকেই শরীরের উৎপত্তি। এই শরীরই আত্মা। এই বিশিষ্ট বিন্যাসের নিকটতম কারণরূপ এইমতে পিতামাতার মিলনকেই নির্দেশ করা হয়েছে- 'শোণিতশুক্রসম্ভবঃ পুরুষো মাতাপিতৃনিমিত্তকঃ শরীরমিদং মৈথুনাদেবোদ্ ভূতম'। এই মতে, মহাপ্রলয়ের অবস্থা স্বীকৃত হয় না। সুতরাং

আদিতে প্রাণশক্তি বা চৈতণ্যের কিরূপে উৎপত্তি হল বা আদি পিতামাতার উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে এই প্রশ্নই চার্বাকদের কাছে অবান্তর।[1]

চার্বাকরা বলেন, বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিপুষ্ট করে এইরকম ব্রাহ্মীঘৃত প্রভৃতি খাদ্য ও পাণীয়ের কথা কে না জানে? জীবদেহের স্নায়ুমন্ডলের তারতম্য অনুসারে মানসিক শক্তির তারতম্য ঘটে, এটাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যেমন – গরুর ও মানুষের মস্তিষ্কের প্রভেদ দেখলেই জানা যায় যে উভয়ের বুদ্ধির অত্যন্ত পার্থক্য রয়েছে। আবার দেখা যায় যে, মস্তিষ্কের অংশ বিশেষে পীড়া হলে মানুষের শক্তিবিশেষের হ্রাস বা লোপ পায়। বৃদ্ধকালে মস্তিষ্ক ক্ষীণ হয়ে পড়ে ও দূর্বলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চৈতন্য দেহের উপরই নির্ভর করে, তাই যখন দেহযন্ত্র বিকল হয় তখন স্নায়ুমন্ডল তদীয় উপাদান ভূতচতুষ্টয়ে বিলীন হবে এবং তখন চৈতন্য বিলুপ্ত হবে।

চার্বাকদের ইন্দ্রিয়াত্মবাদের সাথে প্রাচীনকালের কিছু ঋষিদের মতের মিল পাওয়া যায়। যেমন- ঐতরেয় ঋষি মহীদাস ও বলেছেন- "আত্মোক্থং পঞ্চবিধং-পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যেতীংষি"[2]- এই পঞ্চ মহীভূত থেকে বিশ্বের তথা মনুষ্য শরীরের উৎপত্তি হয়েছে, এবং পঞ্চভূতেই তাদের লয় ঘটবে। মৈত্রায়ণী উপনিষদে্ বলা আছে- "অথ পঞ্চমহাভূতানি ভূতশব্দে নোচ্যন্তে্য; অথ তেষাং যৎ সমুদয়ং তৎ শরীরমিত্যুক্তম্। অথ যোহ খলুবাব শরীর ইত্যুক্তং স ভূতাত্মা ইত্যুক্তম্।"[3] পঞ্চমহাভূতের সমুদায়ই শরীর; শরীরই আত্মা। বৃহাদারণ্যকের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও এই মতই সমর্থন করে বলেছেন- "বিজ্ঞান ঘন

[1] চার্বাক দর্শন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পৃঃ ৯২।
[2] পূর্ববৎ, পৃঃ ৮৮।
[3] পূর্ববৎ, পৃঃ ৮৮।

এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যোবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি”।[4] এই ভূতগণ থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি; এই ভূতগণের বিনাশেই বিজ্ঞানের বিনাশ। “যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং, মনশ্চন্দ্রং, দিশঃ শ্রোত্রং, পৃথিবীং শরীরম্, আকাশমাত্মা ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবিতি?”[5] মানুষ মারা গেলে যখন তার বাগাদি অগ্নি প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হয় তখন তার আর কি অবশিষ্ট থাকে (যার পাপ পুণ্যের ফলাফল ভোগ করবে, স্বর্গনরকাদিতে গমন করবে বা জন্মান্তর প্রাপ্ত হবে?) এমন কিছুই থাকে না। কম্বলাশ্বতর বলেছেন “কায়াদেব ততো জ্ঞানং প্রাণাপানাদ্যধিষ্ঠিতা। যুক্তিং জায়ত ইত্যেতৎ কম্বলাশ্বতরোদিতম্”[6] উক্ত মতগুলির সাথে চার্বাকদের ভূতচৈতন্যবাদ অভিন্ন।

কিন্তু চার্বাকদের দেহাত্মবাদ নানা ভাবে সমালোচনা করা যায়। চার্বাকদের দেহাত্মবাদের প্রথম অনুপপত্তি হল দেহের চেতনা স্বীকার করলে দেহাবয়বের ও চেতনা স্বীকার করতে হয়। দেহাবয়বের চেতনা স্বীকার করলে এক দেহে অনেক চেতনা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু অনেক চেতনার মধ্যে ঐক্যমত নাও থাকতে পারে। একদেহে অনেক চেতনার সমাবেশ ঘটলে ঐ চৈতন্য দিগের পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছার উৎপত্তি হলে শরীর উন্মথিত বা নিস্ক্রিয় হতে পারে। কেননা, অনেক প্রভুর একসময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ কার্য করার অভিপ্রায় হলে একজন ভৃত্যের পক্ষে কোন কাজ না করে নিস্ক্রিয় থাকা ছাড়া

[4] পূর্ববৎ, পৃঃ ৮৮।
[5] পূর্ববৎ, পৃঃ ৮৮।
[6] পূর্ববৎ, পৃঃ ৮৮।

যেমন কোন উপায় নেই ঠিক তেমনি একই দেহে বিভিন্ন চৈতন্যের সমাবেশ ঘটলে এবং তাঁদের পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটলে দেহ নিস্ক্রিয় হয়ে পরে।

দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি ও করা যায়, পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণের অনুপপত্তি। দেহাত্মবাদে পূর্বদিনের অনুভূত বিষয় পরদিনে স্মরণ হতে পারে না; কারণ পূর্বদিনে যে শরীর ছিল পরদিনে সে শরীর আর নেই; অন্য শরীর হয়েছে। এমন কি শরীর ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে। বাল্যাবস্থার শরীর যৌবনাবস্থায়, যৌবনাবস্থার শরীর বৃদ্ধাবস্থায় থাকে না; ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। পরিমাণভেদ দ্রব্যভেদের কারণ। এক বস্তুর কালভেদে পরিমাণভেদ হতে পারে না। অবয়বের পরিমাণ অনুসারে অবয়বীর পরিমাণ সমুৎপন্ন হয়। বালশরীরের অবয়ব আর বৃদ্ধশরীরের অবয়ব এক নয়; সুতরাং অবয়বী দেহও এক নয়। দেহই আত্মা হলে বাল্যকালে যে অনুভবিতা ছিল, যৌবনে বা বার্ধক্যে সে অনুভবিতা নেই। সুতরাং বাল্যকালের অনুভূত বিষয় যৌবনে বা বার্ধক্যে স্মৃতিগোচর হতে পারে না; অন্যদৃষ্ট বিষয় অন্যের স্মরণ হবে কি করে? যে যে বিষয় অনুভব করেনি সে সেই বিষয় স্মরণ করতে পারে না। স্মৃতি এবং সেই স্মৃতির জনক অনুভবের মধ্যে সমানকর্তৃকত্ব থাকা আবশ্যক। এই সমানকর্তৃকত্ব, কর্তাটি অপরিবর্তনীয় না হলে সম্ভব হয় না। দেহ পরিবর্তনশীল বলে দেহ, স্মরণ ও পূর্বানুভব এই উভয়ের কর্তা হতে পারে না। যদিও আমরা সকলেই বাল্যকালের অনুভব যৌবনে বা বার্ধক্যে স্মরণ করতে পারি। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে দেহ ভিন্ন কোন অপরিবর্তনীয় সত্তা আছে। যে আমি বাল্যকালে পিতা মাতাকে দেখেছিলাম সেই আমি বার্ধক্যে প্রপৌত্রদিগকে দেখছি এটাই মানুষের অনুভব। সুতরাং আমি বা আত্মা যা কালত্রয়ব্যাপী তা, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল দেহ হতে পারে না।

চার্বাকরা এই আপত্তির উত্তরে বলেন, যেরূপে পূর্বনখ বা পূর্বকেশ কেটে ফেলে দিলে নতুন নখ ও নতুন চুলের জন্ম হয় সেইরূপ বাল্যদেহ একেবারে বিনষ্ট হয়ে যৌবনের দেহ উৎপন্ন হয় না। বাল্যকালের দেহ ও যৌবনের দেহের মধ্যে একটা অভিন্নতা বা তাদাত্ম্য এবং একত্ব রয়েছে। যার ফলে প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয়। চার্বাকরা আরো বলেন যে, পূর্ব অনুভব গুলি যে সকল সংস্কার রেখে যায় সেগুলি পূর্বক্ষণ থেকে পরক্ষণে, উপাদান কারণ থেকে উপাদেয় কার্যে, পূর্বক্ষণের দেহে বাল্যের দেহ থেকে যৌবনের দেহে সংক্রামিত হয়, ঠিক যেমন কস্তুরীর গন্ধ বস্ত্রে সংক্রামিত হয়। এই ভাবে চার্বাকরা পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণের অনুপপত্তি খণ্ডন করেন।

দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে পুনরায় বলা যায় যে কর্ম করবে, সে সেই কর্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করে এটাই হল কর্মবাদের সিদ্ধান্ত। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল দেহ আত্মা, বা কর্মের কর্তা হলে, কর্মকর্তা ও ফলভোগকারী ব্যক্তি দুইজন পৃথক সত্তা হয়ে পরে। কেননা, যে শরীর কর্ম করে ফলভোগের সময় সেই শরীর থাকে না। সুতরাং এটা স্বীকার করতে হয় যে আত্মা রূপ অপরীবর্তনীয় কোন সত্তা আছে, যে কর্মের কর্তা এবং ভোক্তা। দেহ আত্মা হতে পারে না।

চার্বাকরা এই আপত্তির উত্তরে বলেন, এই আপত্তি গুরুত্বহীন। কারণ চার্বাকরা কার্য কারণ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেন; সুতরাং অদৃষ্ট বা কর্মফল ও চার্বাকরা স্বীকার করেন না। ফলে এই আপত্তিটি চার্বাকদের কাছে নির্মস্তকের শিরঃপীড়ার মত অপ্রাসঙ্গিক।

এখন দেখে নেওয়া যাক আত্মা সম্পর্কে জৈনদের মত কি।

জৈন দর্শনে আত্মা বা জীবের স্বরূপ

জৈন দার্শনিকরা বলেন, সমগ্র বিশ্ব জীব ও অজীব এই দুই পদার্থের কোন একটির অন্তর্গত। জীব হল যার চৈতন্য আছে। অজীব হল যার চৈতন্য নেই। জৈনমতে চৈতন্য জীবের স্বরূপ বা গুণ ('চেতনা লক্ষণো জীবঃ')। যা জীব হতে ভিন্ন তাকে অজীব বলা হয়েছে। ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী যার জীবন আছে তাই জীব। কিন্তু জৈন দর্শনে চেতন দ্রব্যকেই জীব বলা হয়েছে। অন্য ভারতীয় দর্শনে যাকে আত্মা বলা হয় জৈন দর্শনে তাকেই জীব বলা হয়েছে।

জৈন দর্শনে বলা হয় চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক বা সহজাত ধর্ম। চৈতন্যের স্বাভাবিক পরিণতি দ্বিবিধঃ জ্ঞান ও দর্শন। এ দুটি জীবের উপযোগ। জীব ও কর্মের অবয়ব ভিন্ন। জীবাবয়ব ও কর্মাবয়ব একে অন্যের মধ্যে অণুপ্রবিষ্ট হয়। দ্বিবিধ অবয়বের সংযোগ কখনও শিথিল, কখনও বা দৃঢ় থাকে। ফল দানের জন্য কখনও কখনও কর্মাববয়ব জীবাবয়বের সংযোগ শিথিল করে তাতে প্রবেশ করে। জীবাবয়ব ও কর্মাবয়বের এই সংমিশ্রণের নাম 'প্রদেশবন্ধ'। কর্মাবয়ব ফলদানের জন্য জীবাবয়বের সংযোগ শিথিল করে এবং তাতে প্রবেশ করে। এভাবে কর্মাবয়ব জীবাবয়বের সংমিশ্রন ঘটলে, জীব তাদের ভেদ জানতে পারে না। কর্মাবয়ব পৃথক না হওয়া পর্যন্ত জীবের মুক্তি হয় না এবং প্রদেশবন্ধ বা বন্ধ অবস্থা চলতেই থাকে। উপযোগের (Conscious activity) সাহায্যেই জীবায়ব ও কর্মাবয়বের ভেদ জানা সম্ভব। উপযোগ জীবের মোক্ষমার্গ প্রস্তুত করে। উপযোগ দুরকম হতে পারে – সাকার ও নিরাকার। সাকার উপযোগ জ্ঞান ও নিরাকার উপযোগ দর্শন। উপযোগের দ্বারা জীব তার স্বরূপ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ম পরমাণু এই জ্ঞান ও দর্শন রূপ চৈতন্যের পরিনতি লাভ করতে পারে

না। চৈতন্যে সকল জীবের সাধারণ অবস্থা অর্থাৎ তা জীবের স্বরূপ বা স্বরূপ গত গুণ। গুণের ক্রমভাবী পরিণতিকে পর্যায় বলে। স্বাভাবিক ধর্মের বিভিন্ন পরিণতি পর্যায়। জীবের স্বাভাবিক ধর্মের পরিণতি বলে জীবের পর্যায়কে তার স্বরূপ বলা হয়। এই পর্যায়গুলি পঞ্চবিধঃ ঔপশমিক, ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশমিক, ঔদয়িক ও পারিণামিক। কর্ম কারণের অধীন। কর্মের পরিণতিশূণ্য অবস্থা হলে, তা ঔপশমিক অবস্থা। কর্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা ক্ষয়ের অবস্থা ক্ষায়িক অবস্থা। কর্মের আংশিক ক্ষয় ও আংশিক উপশম হলে ক্ষয়োপশমিক অবস্থা। কর্মের উদয় হলে ঔদয়িক অবস্থা। এই অবস্থায় কর্ম ফলদায়ী হয়। কর্মাবয়ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অবস্থা পারিণামিক অবস্থা। এই পাঁচটি অবস্থার প্রথম চারটি জীবের নৈমিত্তিক অবস্থা। পারিণামিক অবস্থা জীবের স্বরূপাবস্থা। তাই উপযোগ। জীবের স্বাভাবিক অবস্থার প্রথম চারটির কোনটিই ঘটে না। এই বিভিন্ন অবস্থার ব্যাখ্যায় জৈন দার্শনিকরা আর ও বলেন, জীবে (আত্মায়) কর্মের উদয় না হলে, জীবের উপশমিক অবস্থা ঘটে। জলে ফট্‌কিরি ফেললে তাতে যে কাদা থাকে তা নীচে জমে যায় এবং স্বচ্ছ হয়। তেমনই, কর্ম ফল উৎপাদনে শক্তিহীন হলে, জীবের ঔপশমিক অবস্থা হয়। আর্হত তত্ত্বের অনুসন্ধান দ্বারা রাগ প্রভৃতি পঙ্কের ফালন হলে,জীবের ক্ষায়িক অবস্থা হয়। কর্মের ক্ষয়ে জীবের যে অবস্থা জন্মায়, তা ক্ষায়িক। যেমন জলের যে অংশ পঙ্ক থেকে পৃথক হয়ে স্ফটিকের মত স্বচ্ছতা লাভ করে, জীবের ক্ষায়িক অবস্থাও সেরূপ মোক্ষদশায় এরূপ হয়। কর্মের উদয় অবস্থা জীবের ঔদায়িক অবস্থা। কর্ম, কর্মের উপশম প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা নিরপেক্ষ স্বাভাবিক চৈতন্যাবস্থাই জীবের পারিণামিক অবস্থা। ভাব্য ও অভাব্য, উভয় ভাবেই জীবের স্বরূপাবস্থা চৈতন্য। উল্লেখ্য যে, ভাব্য জীব বলতে বোঝায়

যে জীব সম্যক দর্শন বিশিষ্ট হয়ে মোক্ষলাভে ইচ্ছুক হয়, আর যে জীবে ঐ লক্ষণ নেই তাকে অভব্য বলে।[7]

জৈন মতে দ্রব্য মাত্রই গুণ ও পর্যায় যুক্ত। আত্মাও দ্রব্য হওয়ায় তা গুণ ও পর্যায় যুক্ত। গুণের দিক থেকে আত্মা নিত্য কিন্তু পর্যায়ের দিক থেকে আত্মা অনিত্য।

জৈন দর্শনে চৈতন্যকে আত্মা বা জীবের স্বরূপ বলা হয়েছে। আবার চৈতন্যকে জীবের গুণ ও বলা হয়েছে। চৈতন্য বা জ্ঞান জীবের স্বরূপ হলে জীব বা আত্মা চৈতন্য থেকে অভিন্ন হয়; আবার চৈতন্য জীবের গুণ হলে জীব চৈতন্য থেকে ভিন্ন হয়। জৈন মতে, আত্মা চৈতন্য থেকে ভিন্ন নয়, আবার অভিন্ন ও নয়। আত্মা চৈতন্য থেকে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়ই। তাই বলা হয়েছে জ্ঞানাদ্‌ভিন্ন ন নাভিন্নোত ভিন্নাভিন্নঃ কথঞ্চনঃ। জ্ঞানং পূর্বাপরীভূতং সোহয়মাত্মোতি কীর্তিতঃ"।[8] অর্থাৎ জীব বা আত্মা জ্ঞান হতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়। আসলে জৈনগণ অনেকান্তবাদী। তাঁরা বলেন, সৎ বস্তুর কোন রূপ নিশ্চিত নয়। বস্তুর সকল রূপ অনিশ্চিত এটাই সপ্তভঙ্গি নয়ের তাৎপর্য। জৈন মতে চৈতন্য জীবের স্বাভাবিক অবস্থা। এই চৈতন্যেরই একটি বিশেষ অবস্থা "জ্ঞান"। এই বিশেষ অবস্থা থেকে জীব অত্যন্ত ভিন্ন নয়। জীবের সাথে তা অত্যন্ত অভিন্ন ও নয়। জ্ঞান রূপ বিশেষ অবস্থা জীবের সাথে ভিন্ন ও অভিন্ন দুই-ই। জীবের নিজের দৃষ্টিকোন থেকে এই জ্ঞান তার সাথে অভিন্ন। অন্যের দৃষ্টিকোন থেকে, সেই জীবেরই অজ্ঞানবত্তার জন্য তার থেকে ভিন্ন ও। জ্ঞানের প্রবাহই আত্মা বা জীব।

---

[7] ভারতীয় দর্শন, দেবব্রত সেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃঃ ৪৯-৫১।

[8] সর্বদর্শনসংগ্রহ, অনুবাদ সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ১ম খন্ড,১৩৮৩, পৃঃ ৭৪-৭৫।

জৈন দর্শনে জীবকে অস্তিকায় দ্রব্য বলা হয়েছে। জীবের বিস্তৃতি আছে। জীব বা আত্মা স্থান বা দেশ জুড়ে থাকে। আত্মা সংকোচন ও প্রসারণে সমর্থ। আত্মা যে দেহে থাকে সে দেহের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হতে পারে না, কেননা তাহলে দেহের অনুভূতিকে আত্মা নিজের বলে অনুভব করতে পারে না। একটি হাতির দেহের আত্মা যত বিস্তৃত, একটি মশার দেহে তত বিস্তৃত নয়। আত্মা দেহ সমানুপাতিক। আত্মা দেশ জুড়ে থাকলেও জড় বস্তুর মতো দেশ জুড়ে থাকে না। কোন দেশ বা স্থানে দুটি জড় বস্তু থাকতে পারে না। কিন্তু দুটি আত্মা একই স্থানে থাকতে পারে। জীব বা আত্মা আলোর মতো দেশ জুড়ে থাকে। প্রদীপের আলো যেমন কোন একটি ঘরের সর্বত্র জুড়ে থাকে এবং ঐ ঘরের আকার ধারণ করে, সেরূপ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা স্বরূপত মূর্তিহীন হলে ও যখন যে দেহে থাকে তখন তার আকার ধারণ করে। আত্মা অসীম নয়, কিন্তু দেহের আয়তন বিশিষ্ট। আত্মা অসংখ্য এবং মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট, অর্থাৎ বিভু পরিমাণ বা অণু পরিমাণ বিশিষ্ট নয়।

জৈন মতে জীব দুই প্রকার বদ্ধ বা সংসারী এবং মুক্ত জীব। জন্ম থেকে জন্মান্তরে পরিভ্রমনকারী জীব সংসারী বা বদ্ধ। বদ্ধজীব আবার দুই প্রকার এস ও স্থাবর। এস শব্দের অর্থ গতিশীল, স্থাবর শব্দের অর্থ গতিহীন। পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ। পৃথিবী প্রভৃতিকে যারা কায়রূপে গ্রহণ করবে তারা স্থাবর জীব। এই স্থাবর জীবগুলি সর্বাপেক্ষা অপূর্ণ দেহের অধিকারী এবং কেবল মাত্র স্পর্শ ইন্দ্রিয়যুক্ত। পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু ও উদ্ভিদ দেহাশ্রয়ী জীবের চৈতন্য সবচেয়ে কম। যে জীব আর জন্মগ্রহণ করবে না তা

মুক্ত জীব। মুক্ত জীব কর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে তাদের চৈতন্য সবচেয়ে বেশী।

জৈন মতে আত্মা বা জীব স্বরূপত পূর্ণ। জীবের অনন্ত সম্ভাবনা আছে। জীব স্বরূপত অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বিশ্বাস, অনন্ত বীর্য, অনন্ত আনন্দ সম্পন্ন। কর্ম বা কর্মপুদগলের প্রভাবে জীবের স্বরূপ থেকে বিচ্যুতি ঘটে এবং জীব নিজেকে অজ্ঞ বলে মনে করে। যে দ্রব্য সংযোগ ও বিভাগযোগ্য তাই পুদগল। পুদগল হল অচেতন জড় দ্রব্য। পুদগল এর প্রতিবন্ধকতার জন্যই জীব তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার পরিচয় পায় না। জৈন দার্শনিকরা জীবের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের সাহায্য নিয়েছেন।

জৈন মতে "আমি সুখ অনুভব করছি" এই অবাধিত সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সরাসরি প্রমাণিত হয়। আমরা যখন কোন দ্রব্যের গুণ প্রত্যক্ষ করি, তখন আমরা বলি যে আমরা দ্রব্যকেও প্রত্যক্ষ করি। একই যুক্তিতে আমরা বলি যে, আত্মার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়, যেহেতু সুখ, দুঃখ, স্মৃতি, সংশয়, জ্ঞান প্রভৃতি আত্মার ধর্মকে আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি।

জৈন মতে আত্মার অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে অনুমান দ্বারা ও প্রমাণিত হতে পারে। সেই অনুমান গুলি হল-

১. একটি গাড়ির মত শরীরকে ইচ্ছামত পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রন করা যায়। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, কোন একজন কর্তা আছে যে দেহকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রন করে।

২. চক্ষুরিন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি কতকগুলি যন্ত্র মাত্র, সুতরাং তাদেরকে পরিচালিত করার জন্য একজন কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। সেই কর্তাই আত্মা।

৩. তাছাড়া 'আমরা আত্মার অস্তিত্ব নেই' এই উক্তি 'আমার মা বন্ধা' বা 'সূর্য যে আলো দেয়, তার অস্তিত্ব নেই' এই উক্তিগুলির মতই অর্থহীন।

তবে জৈনদের জীব সম্পর্কে মতবাদ গ্রহনযোগ্য হয় না। আত্মা বা জীব দেহের আয়তন বিশিষ্ট এই মত শঙ্করাচার্যের মতে গ্রহনযোগ্য নয়। কেননা আত্মা দেহের দ্বারা সীমিত হওয়ার ফলে আত্মা দেহের মতো অনিত্য হয়ে পড়বে এবং আত্মা অনিত্য হলে আত্মার মুক্তি লাভ সম্ভব হবে না। তাছাড়া আত্মা একটি বিশেষ দেহ পরিত্যাগ করলে অসুবিধা সৃষ্টি হবে যখন জন্মান্তরে আত্মাকে একটি বৃহত্তর শরীরে থাকতে হয়। আমরা স্থূলভাবে ধারণা করতে পারি যে, বিভিন্ন অংশের সংযোগ বা বিয়োগের দ্বারা আত্মা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর বা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে সমর্থ। নতুন নতুন অংশ সর্বদাই সংযুক্ত হবে এবং পুরাতন অংশ সর্বদাই বিযুক্ত হবে, ফলে একই আত্মা যে দীর্ঘক্ষন স্থিতিশীল থাকে সে বিষয়ে আমরা কখনই নিশ্চিত হতে পারি না। যদি বলা হয় যে, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ অপরিবর্তিত থাকে, সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন অংশের মধ্যে পার্থক্য করার কোন উপায় নেই। জৈনদের ন্যায় মীমাংসকরাও আত্মাকে চৈতন্য থেকে স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করে। এখন তাঁদের অভিমত দেখে নেওয়া যাক।

মীমাংসা দর্শনে আত্মতত্ত্ব

মহর্ষি জৈমিনি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, দেহ থেকে স্বতন্ত্ররূপে স্থায়ী নিত্য আত্মার আস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। মীমাংসক বেদের নিঃশর্ত অনুসারী। তাঁরা বৈদিক বিধি ও নিষেধ স্বীকার করেন। বৈদিক বিধি অনুসারে যাগ প্রভৃতি শ্রৌতকর্ম যথাবিহিত অনুষ্ঠান করলে, যজমান ফল লাভ করেন। তবে, এই জন্মেই সকল ফল লাভ নাও হতে পারে। তাই কর্মের ফল ভোগ উপপাদনের জন্য মীমাংসকগণ জীবের জন্মান্তর, কর্মফল প্রভৃতি স্বীকার করেন। যাগ প্রভৃতি কর্মানুষ্ঠানের ফলে যাগ কর্তার আত্মাতে একটি শক্তি উৎপন্ন হয়, এই শক্তি অতিন্দ্রিয়। এই শক্তি অনেক কালের মধ্যে দিয়ে পরিণতি লাভ করে। শক্তি পরিণত হলে ফল উৎপন্ন হয় এবং আত্মা সেই হল ভোগ করে। যতদিন ফল উৎপন্ন না হয়, ততদিন আত্মা কর্মান্তর জনিত ফলভোগের জন্য এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। এভাবে আত্মা পূর্বজন্মে কৃত কর্মের ফলভোগ করে। এবং যথাবিধি যাগের অনুষ্ঠাতা মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করে। অপর একটি মতে বলা হয়, মৃত্যুর পরেও মন থাকে এটা শ্রুতি সিদ্ধ। এই নিত্য মন কর্মফলরূপ অদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুর পর অপর দেহের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়। সেই দেহেই তখন জন্মান্তরীয় কর্মফলের ভোগ হয়। কারণ- সেই দেহেই সেই আত্মার সুখ দুঃখাদি ভোগের অধিষ্ঠান হয়।[9]

যাইহোক মীমাংসা দর্শনে মহর্ষি জৈমিনি থেকে শুরু করে ভাষ্যকার শবর ও জ্ঞাতারূপ স্থায়ীসৎ আত্মা স্বীকার করেন। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী সিদ্ধান্ত নিরসনের জন্য শবর বলেন, জ্ঞানক্রিয়ার অতিরিক্ত রূপে স্থায়ী আত্মা সৎ। এই আত্মা স্বসংবেদ্য। অন্য বিষয়ের মত আত্মাকে অন্য কর্তৃক দেখা সম্ভব

[9] পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন, সুখময় ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, পৃঃ ১৮৮-১৮৯

নয় কিংবা অন্যকে দেখান যায় না। আত্মা স্বয়ং জ্যোতিও বটে। অহং প্রতীতির বিষয়রূপে আত্মা জ্ঞাত হয়। আত্মার স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসকগণ বলেন-জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মা বা জীবের গুণ। শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ অনাদি। ভোগ, স্বর্গ প্রাপ্তি, মুক্তি প্রভৃতি জীবেরই হয়ে থাকে। এই বিষয়ে প্রভাকর ও ভাট্ট মীমাংসকদের মধ্যে মতবিরোধ না থাকলেও আত্মা সম্পর্কে অনেক ব্যাপারে প্রভাকর ও কুমারিলগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন।

মীমাংসা দর্শনে প্রভাকরের মতে, 'আত্মা অচিদ্ রূপ অর্থাৎ জড় পদার্থ'। মনঃসংযোগ হলে আত্মাতে চেতনার আর্বিভাব হয়। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মার গুণ। এদের মতে প্রত্যেক জ্ঞানই জ্ঞান, তদাশ্রয় আত্মা এবং জ্ঞানের বিষয়-এই তিনটিই প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই জন্য প্রভাকরের মতাবলম্বিগণকে 'ত্রিপুটিপ্রত্যক্ষবাদী' বলা হয়। ত্রিপুটিসংবিদবাদী প্রাভকর বলেন, 'আমি ঘট জানি'- ইত্যাদি আকারের জ্ঞানে আত্মা (জ্ঞাতা), বিষয়প্রকাশকালে জ্ঞানের আশ্রয়রূপে প্রকাশিত হয়। জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের প্রকাশ সকল জ্ঞানের একই সাথে হয়। 'আমি আমাকে জানি' বলে যে ব্যবহার হয়, সেটি গৌণ। তাই এই গৌণ ব্যবহার দ্বারা আত্মার জ্ঞানকর্মতা প্রমাণিত হয় না। যদি জ্ঞান মাত্র- ই, জ্ঞানকর্তৃক বিষয় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ না হয়, তাহলে, নিজের জ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে অন্যের জ্ঞাত বিষয়ের ভেদ থাকে না। এই ভেদ জ্ঞান উপপাদনের জন্যই স্বীকার করতে হয় যে, বিষয় প্রকাশকালে আত্মা জ্ঞাত হয়। বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ না হলে আত্মা কখনও প্রকাশিত হয় না। প্রভাকর আরো বলেন, সকল বিষয় জ্ঞানে আত্মার প্রকাশ মানতেই হয়। অন্যথা স্ববেদ্য ও পরবেদ্যেরে ভেদ হতে পারে না।

অপরদিকে ‘ভাট্ট মতে আত্মা চিদাচিদ্ রূপ’।[10] সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রার কালেও জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব হয় না। ‘আমি সেই সময় জড়ভাবে সুপ্ত ছিলাম’- সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির এই প্রকার জ্ঞান হয়ে থাকে। সুষুপ্তিকালে যদি জড়তার অনুভব না থাকত, তবে পরে স্মরণ হতে পারত না। অতএব সুষুপ্তিকালে অনুভব অবশ্যই ছিল। অনুভব ছিল বলেই জীব চিদ্ রূপ। সুষুপ্তিকালে আত্মাতে স্থিত জড়তা ব্যতীত অপর বস্তুতে স্থিত জড়তার অনুভব সম্ভবপর নয়। অতএব আত্মা অচিদ্ রূপ। জোনাকি পোকার প্রকাশ ও অপ্রকাশ রূপের ন্যায় জীব ও জড় এবং অজড় স্বরূপ। কুমারিল বলেন, স্ববেদ্য ও পরবেদ্যের ভেদ জ্ঞানের জন্য আত্মার প্রকাশ স্বীকার অনাবশ্যক। জ্ঞান মাএই আত্ম সমবেত, আত্ম সমবেত রূপ জ্ঞান উৎপন্ন হলেই, স্ববেদ্য ও পরবেদ্যের ভেদের অনুভব উৎপন্ন হয়ে যায়। জ্ঞান আত্মসমবেত বলে, উৎপন্ন হলেই জ্ঞাতা স্ববেদ্য ও পরবেদ্যের ভেদ বুঝতে পারে। তাছাড়া কুমারিল মনে করেন, আত্মার প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কারণ, যা ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট কেবল তারই প্রত্যক্ষ হয়। আত্মা ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হতে পারে না। আত্মার প্রত্যক্ষ মানলে, ‘প্রত্যক্ষ’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুপপন্ন হয়।

অদ্বৈত বেদান্তী শংকরাচার্য বলেন, জ্ঞান ও আত্মা (জ্ঞাতা) অভিন্ন। তা স্বপ্রকাশ। এই বক্তব্যের সমর্থনে, ‘অয়ং পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ ‘আত্মৈবাস্য জ্যোতিঃ’ ইত্যাদি বেদান্ত বাক্যকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রভাকর ও কুমারিল উভয়েই অদ্বৈত বেদান্তীদের এই মতের সমালোচনা করেছেন। এই মতের বিরুদ্ধে প্রভাকর বলেন, যদি আত্মা স্বপ্রকাশ হত, তাহলে

[10] পূর্ববৎ, পৃঃ ১৮৯।

জাগ্রত ও স্বপ্নদশার মত সুষুপ্তিতেও আত্মার প্রকাশ ঘটত। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, আত্মা জ্ঞান স্বরূপ। সুষুপ্তিকালে কোন জ্ঞানের প্রকাশ না ঘটায়, অদ্বৈত অভিমত আত্মা ও তখন অস্তিত্বশীল নয় বলে প্রমাণিত হয়। মোক্ষদশায় কাজের প্রকাশ থাকে না। অথচ, তখন আত্মার অস্তিত্ব থাকে। প্রভাকর বলেন, জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র আত্মা জ্ঞানবিরহিত শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করে। আত্মাকে স্বপ্রকাশ বলে স্বীকার নিস্প্রয়োজন। শুধুমাত্র জ্ঞানকেই স্বপ্রকাশ বলে স্বীকার করলেই চৈতন্যের বিভিন্ন অবস্থার ব্যাখ্যা করা যায়।

কুমারিল ও অদ্বৈত বেদান্তীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বলেন, 'আত্মা স্বপ্রকাশ' বললে 'সমাসীন আত্ম জ্ঞানানাং' (আত্মা মানুষের দ্বারা জ্ঞাত হয়) প্রভৃতি বেদান্ত বাক্যের সঙ্গে এই মতের বিরোধ হয়। কুমারিল আরো বলেন, "আত্মা নিজের প্রকাশের জন্য জ্ঞানান্তর অধীন, কারণ, তা ব্যবহারের বিষয়; যেমন ঘট" এই অনুমানের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়। বস্তুত, জ্ঞান ব্যবহারের বিষয় হয়। তাই, অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত কুমারিল গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

কুমারিল, প্রভাকর উভয়েই বলেন, আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি থেকে ভিন্ন, চার্বাকগণ বলেন, 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ' প্রভৃতি প্রত্যয় দেহগত স্থূলতা, কৃশতা প্রভৃতিকে বিষয় করে। এতে প্রমানিত হয় যে, স্থূলতা, কৃশতা প্রভৃতির অধিকরণ দেহই আত্মা। কুমারিল বলেন, চার্বাকদের এই বক্তব্য অযৌক্তিক। আত্মার বিশেষ গুণ সুখ, দুঃখকে দেহের গুণ বললে অনুপপত্তি হয়। যদি সুখ প্রভৃতি দেহের গুণ হত তাহলে মৃতদেহে ও এই সকল গুণ গুলিকে দেখা যেত কিন্তু মৃতদেহে এইগুণ গুলিকে দেখা যায় না। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে

সুখ প্রভৃতি গুণ দেহ ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয়রূপে দেহাভিন্ন রূপে আত্মা সিদ্ধ হয়। দেহ ও আত্মার অত্যন্ত সংসর্গের জন্যই 'আমি স্থূল' বা 'আমি কৃশ'-এরূপে আমাদের জ্ঞান হয় ঠিক যেমন- জল ও উষ্ণতার অত্যন্ত সংসর্গ বশতই 'জল উষ্ণ' বলে আমাদের জ্ঞান হয়। কোন কোন চার্বাক দার্শনিকগণ বলেন, ইন্দ্রিয়ই আত্মা। কুমারিল চার্বাকদের এই মতের ও বিরোধিতা করে বলেন, ইন্দ্রিয় আত্মা হতে পারে না কারণ, বহিরিন্দ্রিয় সমূহ ভৌতিক। আত্মার বিশেষ গুণ সুখ, দুঃখ প্রভৃতি ভৌত পদার্থে উপলব্ধ হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয় আত্মা নয়। অন্তরিন্দ্রিয় মনকেও আত্মা বলা যায় না। কারণ, আত্মা অপরোক্ষ ভাবে সিদ্ধ। মন দ্বারা আত্মায় সমবেত সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণের প্রত্যক্ষ হয়। এর থেকে বোঝা যায় আত্মা মন থেকে স্বতন্ত্র।

আবার প্রভাকর ও কুমারিল উভয়েই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতবাদের বিরোধিতা করেন। বৌদ্ধ মতে, ক্ষণিক জ্ঞানই আত্মা কিন্তু কুমারিল বলেন, ক্ষণিক জ্ঞান আত্মা হতে পারে না। এস্থলে প্রভাকর ও কুমারিল বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মত খন্ডনের জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তার সাথে নৈয়ায়িকদের প্রদত্ত যুক্তির অনেকাংশেই মিল পাওয়া যায়। কুমারিলের মতে, ক্ষণিক জ্ঞান আত্মা নয় কারণ, 'যে আমি পূর্বে দুঃখ অনুভব করছিলাম, সেই আমিই বর্তমানকালে সুখ অনুভব করছি' -এই উপলব্ধি দ্বারা পূর্বপরকাল স্থায়ী এক আত্মা সিদ্ধ হয় এবং আত্মা ক্ষণিকতা অপ্রমাণিত হয়। আবার প্রভাকর আত্মবাদের সমালোচনায় নৈয়ায়িকদের মত একই যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, যদি নিত্য আত্মা স্বীকৃত না হয় তাহলে প্রত্যভিজ্ঞা, স্মৃতিজ্ঞান, কর্মফলভোগ প্রভৃতি অনুভব উৎপন্নই হতে পারে না।

অদ্বৈত বেদান্তী বলেন, সকল শরীরে আত্মা একই। অবিদ্যার জন্য শরীরাবচ্ছেদে আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ বহু বলে মনে হয়। সূর্য যেমন নানা মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হয় বলে, 'বহু' ও অবিশুদ্ধ রূপে প্রতীত হয়; তেমনই, বিভিন্ন অন্তকরণের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, একই আত্মা বহু জীব রূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু প্রভাকর ও কুমারিল উভয়েই অদ্বৈত বেদান্তীদের এই মতের বিরোধিতা করেন। প্রভাকর বলেন, 'অহং সুখী', 'অহং দুঃখী' প্রভৃতি অনুভব আত্মাকে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিশেষগুণ বিশিষ্ট বলে প্রমাণ করে। প্রভাকর মতে, আত্মা যদি এক হত তাহলে এক আত্মার সুখ, দুঃখ অন্য সকল আত্মারই হয়ে যেত। তাই স্বীকার করতে হয় যে, আত্মা বহু । প্রতিটি আত্মার অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক আত্মা স্বীয় ঐচ্ছিক ক্রিয়ার দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম অর্জন করে। বিভিন্ন আত্মার স্বোপার্জিত ধর্ম ও অধর্মই তাদের স্ব স্ব, দুঃখ প্রভৃতির কারণ। যদি আত্মা এক হত, তাহলে ধর্ম ও অধর্ম বিভিন্ন হত না। ফলে, সুখ ও দুঃখের ভোগেও বৈচিত্র্য থাকত না। অথচ আমরা জানি যে, সকল ব্যক্তিই একই সময়ে সুখ বা দুঃখ অনুভব করে না। সুখ বা দুঃখের অনুভবের যে বৈচিত্র্য তা সর্বজনসিদ্ধ। সুতরাং প্রত্যেকের দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয় অর্থাৎ দেহ ভেদে আত্মার বহুত্ব মানতেই হয়। তাছাড়া আত্মাকে 'এক' বলে স্বীকার করলে, নৈতিক দায় ও কর্মফলভোগ অনুপপন্ন হয়। প্রত্যেক আত্মা অনুভব করে যে, তারা স্বকীয় ইচ্ছার জন্য তার দৈহিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। কোন আত্মাই অনুভব করে না যে, অন্যের ইচ্ছা তার দৈহিক ক্রিয়ার কারণ কিংবা তার স্বকীয় ইচ্ছা অন্যের দৈহিক ক্রিয়ার কারণ। তাই, অন্যের দৈহিক ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে অনুমান করা হয় যে, তার ইচ্ছাই তার দৈহিক ক্রিয়ার কারণ। এই ইচ্ছার আশ্রয়

রূপে আত্মা অনুমিত হয়। এক আত্মা অন্য আত্মার প্রত্যক্ষ বিষয় হতে পারে না। তাই আত্মার বহুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

আত্মার বহুত্ব প্রমাণের জন্য কুমারিল প্রভাকরের প্রদত্ত যুক্তি সমর্থন করে বলেন, যদি 'আত্মা এক' বেদান্তের এই মত স্বীকার করা হয় তাহলে গুরুতর অনুপপত্তি ঘটে। এক ব্যক্তির পায়ে কাঁটা ফুটলে, সেই কাঁটা তুলতে তার হাত সক্রিয় হবার সাথে সাথে অন্য সকলেরই হাত সক্রিয় হবার আপত্তি অনিবার্য হয়। তাই কুমারিলের মতে আত্মা বহু।

কুমারিল বলেন, আত্মা অণু পরিমাণ বা মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট হতে পারে না। জৈন মতে, আত্মা মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট। কিন্তু কুমারিল জৈনদের মতের বিরোধিতা করে বলেন, আত্মা যদি মধ্যম পরিমাণ হত, তাহলে আত্মার শরীরে তুল্য পরিমাণ স্বীকার করতে হত। যদি আত্মার (শরীরের তুলনায়) অধিক পরিমাণ স্বীকৃত হয়, তাহলে, অধিকতর পরিমাণ বিশিষ্ট আত্মার তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণ শরীরে প্রবেশ ব্যাহত হয়। যদি শরীরের তুলনায় আত্মার ন্যূন পরিমাণতা স্বীকৃত হয়, তাহলে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির পক্ষে একই সঙ্গে পা ও মাথার বেদনা অনুভব করা অনুপপন্ন হয়। আবার আত্মা শরীরের সম পরিমাণ একথাও বলা যায় না। কারণ- যদি তাই হত, তাহলে, হাতি প্রভৃতির মত বিশাল শরীরগত আত্মার পক্ষে মশা প্রভৃতির মত ক্ষুদ্র শরীরে প্রবেশ করা সম্ভব হত না। সেক্ষেত্রে, বহুশ্রুত ও স্মৃতিবাক্যের সঙ্গে সিদ্ধান্তের বিরোধ হত। আত্মা অণু পরিমাণও হতে পারে না। কারণ, কোন ব্যক্তির পা ও মাথা উভয় এই একই কালে আঘাত লাগলে সে দুটি বেদনাই উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু আত্মা অণু

পরিমাণ হলে তা সম্ভব হত না। কুমারিল ও প্রভাকর উভয়েরই মতে, আত্মা বিভু পরিমাণ। 'ইদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বং'- ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য আত্মার বিভুত্ব সাধন করে।[11]

এই অধ্যায়ে আলোচিত মতগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণীয় বলে মনে হলেও পর্য্যালোচনা করে দেখা গেল যে, কোন মতবাদই গ্রহণযোগ্য নয়।

[11] ভারতীয় দর্শন, দেবব্রত সেন, পৃঃ ২০৩-২০৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চৈতন্য স্বরূপ আত্মা

প্রথম অধ্যায়ে চৈতন্য ভিন্ন সত্তাকে আত্মা বলেছেন যারা তাদের মতগুলি আলোচনা করার পর এখন আমরা দেখবো বৌদ্ধ, সাংখ্য ও অদ্বৈত বেদান্তবাদীদের মত যারা চৈতন্য প্রবাহ বা শুদ্ধ চৈতন্যকে আত্মা বলেছেন।

বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ বা অনাত্মবাদ

উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, রামানুজ প্রভৃতি দর্শন সম্প্রদায়ের মতে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন ও নিত্য। আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এই সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা বলেন, চার্বাকরা। চার্বাক মতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহই আত্মা হওয়ায় আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে ও আত্মা জড়স্বভাব। বৌদ্ধগণ বুদ্ধের বাণী অনুবল সারী মধ্যমার্গী। তারা উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব যেমন মানেন নি, তেমনই দেহাত্মবাদী চার্বাকদের মতও মেনে নিতে পারেন নি। বৌদ্ধমতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ। এই দুটি প্রমাণের সাহায্যে যা সৎ বলে প্রমাণিত হয়, তাই-ই সৎ বলে গ্রাহ্য। উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, উপনিষদ্ এবং তার অনুসারে নানা দর্শনে যে স্থির(নিত্য), চৈতন্যস্বরূপ কিংবা চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মসত্তার কথা বলা হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই উপনিষদীয় আত্মাতত্ত্ব অপ্রামাণিক। উপনিষদের আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে প্রত্যভিজ্ঞা, স্মৃতিজ্ঞান, এমনকি যেকোন জ্ঞানক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিতে গেলে

শাশ্বত নিত্য আত্মা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু বৌদ্ধগণ বলেন নিত্য আত্মা স্বীকার না করেও এগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। আবার বৌদ্ধগণ চার্বাকদের দেহাত্মবাদ ও মানেননি। বৌদ্ধগণ বলেন, দেহাত্মবাদ মানলে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, তাছাড়া আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্র কেননা, দেহেরই তাগিদে কামনা বাসনা জন্মায়। কামনা বাসনাই সকল দুঃখের কারণ। দেহাত্মক ইন্দ্রিয় জনিত জ্ঞান তৃষ্ণার জনক। তৃষ্ণা থেকে আসক্তি হয়। আসক্তি সকল দুঃখের হেতু। দেহের কঠিন বন্ধন থেকে মুক্ত না হতে পারলে, সকল দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না। দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য, সকল তুচ্ছ করে, বুদ্ধ কঠোর সাধনা করেছেন। এই কঠোর সাধনার বলে তিনি যে চারটি আর্যসত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তাদের মানতে গেলে, আত্মাকে দেহ থেকে ভিন্ন বলেই মানতেই হবে।

সুতরাং বৌদ্ধমতে দেহ ভিন্ন আত্মা থাকলেও তা নিত্য নয় অনিত্য। বৌদ্ধ দর্শনে ক্ষণিকত্ববাদ ও প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নৈরত্ম্যবাদ স্বীকার করা হয়েছে। নৈরত্ম্যবাদ বলতে জড় ও চেতন, সকল স্থায়ী দ্রব্যেরই সত্তার অস্বীকৃতিকে বোঝায়। প্রমাণ সাপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা বৌদ্ধগণ প্রমাণ করেছেন যে, ক্ষণিক ও নিত্য পরিবর্তনশীল অনুভূতির অতিরিক্ত স্থায়ীসৎ আন্তরদ্রব্য অসৎ। দৈহিক সংগঠন (Physical frame), সংবেদন (Sensation), ও ধারণা (Idea) সমূহের সংঘাতই আত্মা। এই সংঘাতবাদ এবং নৈরত্ম্যবাদ বৌদ্ধদের একই সিদ্ধান্তের দুটি দিক। 'নৈরত্ম্য' শব্দটি নঞর্থক, যা বস্তু কি নয় তাই বলে। অপরপক্ষে, 'সংঘাত' বা 'সন্তান' শব্দ সদর্থক, যা বস্তু কিরূপ তাই বিবৃত করে।

বৌদ্ধ মতে বিজ্ঞান বা চৈতন্যের প্রবাহই আত্মা। বিজ্ঞান ক্ষণিক। বিজ্ঞান একটি ক্ষণে উৎপন্ন হয় এবং পরক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং নতুন আর একটি বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। এই পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান প্রবাহ ছাড়া আত্মা বলে পৃথক কোন সত্তা নেই। চক্র, আসন প্রভৃতি অংশের একটি বিশেষ সন্নিবেশকে বোঝাতে রথ শব্দের ব্যবহার হয়। ঐ অংশ গুলির অতিরিক্ত রথ বলে স্বতন্ত্র বস্তু নেই। বৃক্ষ সমূহের অতিরিক্ত বন বলে কিছু নেই। তথাপি লোকে যেমন 'রথ', 'বন' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করে, তেমনি 'আত্মা', 'পুদ্গল', 'সত্ত্ব' শব্দ লোকব্যবহারে প্রচলিত। 'রথ', 'বন' প্রভৃতি শব্দ নাম বা প্রতীক মাত্র। এদের বাচ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নেই। একইভাবে 'পুদ্গল', 'আত্মা', সত্ত্ব প্রভৃতি শব্দ আমাদের ভাষায় প্রায় ব্যবহৃত হলেও সেগুলি কোন সৎ বস্তুর বাচক নয়। এরা নাম মাত্র। দৈহিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের সংঘাতই আত্মা। বৌদ্ধ পরিভাষায়, দৈহিক অবস্থাসমূহকে সম্মিলিতভাবে 'রূপ' এবং মানসিক অবস্থাসমূহের সংঘাতই 'নামরূপ' (Phycho-Physical organism, Mindbody complex)। 'আত্মা' নামক সংঘাত নির্মাতা দৈহিক অবস্থাসমূহকে 'রূপ' এবং মানসিক অবস্থাসমূহকে 'নাম' বলে। কোন ও কোনও বৌদ্ধগ্রন্থে, আত্মা সম্পর্কে অন্য বিবরণ পাওয়া যায়। যেসব দৈহিক ও মানসিক অবস্থার সংঘাতই আত্মা, তাদের স্বরূপ ও ক্রিয়ার গভীরতর বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি এই বিবরণ। এখানে, আত্মাকে 'পঞ্চস্কন্ধ' বলা হয়েছে। রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ- এই পাঁচটি স্কন্ধের সমাহারই 'নামরূপ' বা আত্মা। এই পাঁচটি স্কন্ধের মধ্যে 'রূপস্কন্ধ' বলতে 'রূপ' এবং অন্য 'চারটি স্কন্ধ' বলতে 'নাম' কে বোঝায়। রূপ বলতে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু দিয়ে নির্মিত 'জড়দেহ' কে বোঝায়। অন্য

চারটি স্কন্ধ, 'আত্মার' নির্মাতা মানসিক অবস্থাসমূহেরই নির্দেশক। সাধারণভাবে বলা যায়, 'বিজ্ঞান' মানে 'আত্মসংবেদন' (Self consciousness), 'বেদনা' মানে 'অনুভব', 'সংজ্ঞা' মানে 'প্রত্যক্ষ' (Perception), 'সংস্কার' মানে 'মানসিক প্রবণতা' (Mental disposition)। আত্মা দেহ মনের সংঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

বৌদ্ধমতে সংঘাত রূপ আত্মা একটি ক্ষণের বেশী কাল অভিন্ন সৎ নয়। সংঘাত নিয়ত পরিবর্তনশীল। নিয়ত পরিবর্তনশীল সংঘাত রূপ আত্মাকে 'সন্তান' (Flux) বা 'ধারা' (Series) বলা হয়েছে। নামরূপাত্মক আত্মা ক্ষণিক ও পরিবর্তনশীল যেহেতু আত্মার নির্মাতা উপাদান গুলি ক্ষণিক ও সদা পরিবর্তনশীল। বৌদ্ধরা বলেন, আত্মার নির্মাতা প্রতিটি উপাদানই বহ্নি শিখা, জলের প্রবাহ বা ফেনার পুঞ্জের মতো নিয়ত পরিবর্তনশীল, এরা একটি ক্ষণে উৎপন্ন হয়ে পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়।[12]

বৌদ্ধমতে মানুষের মধ্যে আত্মা বলে স্থায়ী সত্তা না থাকলে ও তার জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে। জীবনের এই ধারা বা প্রবাহের মধ্যে যে কোন একটি অবস্থা যেমন তার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে উদ্ভূত, তেমনি তা আবার কোন পরবর্তী অবস্থাকে সৃষ্টি করে। জীবনের এই ধারাবাহিকতার মূলে আছে কার্যকারণ সম্বন্ধ, যা বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। তাই ব্যক্তিটি তার সারা জীবনে নিজেকে একই অভিন্ন ব্যক্তি বলে উপলব্ধি করে। বুদ্ধদেব একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য বিষয়টিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সারারাত্রি জ্বলছে এমন একটি প্রদীপের দিকে তাকালে একটি

[12] পূর্ববৎ, পৃঃ ১০৮।

অগ্নিশিখা দেখা যায়। কিন্তু সারারাত্রি ব্যাপী প্রদীপটিতে একাধিক অগ্নিশিখা থাকে এবং যেকোন মুহূর্তের অগ্নিশিখা অন্য মুহূর্তের অগ্নিশিখা থেকে পৃথক। কিন্তু তারা কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। প্রতি মুহূর্তের অগ্নিশিখা পরবর্তী অগ্নিশিখাকে উৎপন্ন করে এক অবিচ্ছিন্ন ধারা সৃষ্টি করে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও এরূপ ধারাবাহিকতা আছে।

উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব অনুসারী দার্শনিকগণ, প্রাচীন বৌদ্ধগণদের 'নৈরত্ম্যবাদ' রূপ আত্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি তুলেছেন। পরবর্তীকালে, নব্যবৌদ্ধগণ এসব আপত্তির উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। আপত্তিগুলি হল-

১. যদি নিত্য পরিবর্তমান, ক্ষণিক অবস্থা সমূহের সংঘাত প্রবাহ মাত্রই আত্মা হয় এবং প্রতিক্ষণে সৎ একটি আত্মা পরক্ষণে বিনষ্ট হয়ে, তার সদৃশ অন্য আত্মা উৎপাদন করে তাহলে প্রত্যভিজ্ঞা, স্মৃতিজ্ঞান, এমনকি যে কোন জ্ঞানক্রিয়া, কর্মবাদে বিশ্বাস, পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরে বিশ্বাস কীভাবে উৎপন্ন হতে পারে ? স্থায়ী সৎ আত্মা না মানলে এইসব বিষয় অব্যাখ্যাতই থেকে যায়। সুতরাং স্থায়ী আত্মা স্বীকার করতেই হয়।

এর বিরুদ্ধে নব্য বৌদ্ধগণ বলেন, 'প্রত্যভিজ্ঞা' নামক জ্ঞানটি ভ্রান্ত। তথাকথিত প্রত্যভিজ্ঞার আমরা মনে করি, অনুভব ও প্রত্যভিজ্ঞাকালে জ্ঞাত বস্তুটি অভিন্ন এবং জ্ঞাতা অভিন্ন। আসলে সৎ বস্তুমাত্রই ক্ষণিক। তাই কোনও দুটি বস্তুই অভিন্ন হতে পারে না। দুটি জ্ঞাতা ও ভিন্নই। তবে, প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে দুটি জ্ঞাতা বিষয় সদৃশ- কিন্তু অভিন্ন নয়। আমরা সদৃশ্যকে অভিন্ন বলে ভুল করি। যে দুটি বস্তু ভিন্ন, সদৃশতার ফলে তাদের অভিন্ন বলে

মনে করি। যা জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে বলা হয়, তা জ্ঞাতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কারণ, যা সৎ, তা আন্তর বা বাহ্য যাই হোক ক্ষণিকই। বস্তুতঃ, প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে, বহির্বিষয়ক্ষেত্রে সাদৃশ্যে অভিন্নতার যে ভ্রম হয়, তা জ্ঞাতার (আত্মার) ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। মনে করা হয়, আত্মা স্থায়ীসৎ না হলে কোনও স্থায়ীসৎ বহির্দ্রব্যের প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব নয়। বৌদ্ধগণ মনে করেন, তাদের আত্মতত্ত্বের সাহায্যে 'স্মৃতিজ্ঞানের' ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। স্থিরসৎ আত্মবাদী বলেন, সংস্কার জন্য জ্ঞানই স্মৃতিজ্ঞান হতে গেলে, সংস্কারের জনক পূর্বানুভব ও স্মৃতিজ্ঞানের কর্তা অভিন্ন হওয়া দরকার। বৌদ্ধগণ বলেন, আত্মা প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশশীল। তবু স্মৃতি হয়। যে আত্মা পূর্বকালীন কোনও ক্ষণে (পরবর্তীকালীন কোনও ক্ষণের স্মৃতিজ্ঞানের জনক সংস্কারের হেতু) অনুভবের কর্তা, সে তার সত্তাক্ষণের দ্বিতীয় পরর্বতী ক্ষণে বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি সদৃশ আত্মা উৎপাদন করে এবং এভাবেই নব নব আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশের প্রবাহটি চলতে থাকে। পূর্বক্ষণে সৎ অনুভবকর্তা আত্মার অনুভবের ফল যে সংস্কার, সেটি, তার আশ্রয় আত্মা পরক্ষণে বিনষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে, দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন সদৃশ আত্মায় বর্তায় এভাবে, পরবর্তী সকল ক্ষণের বিভিন্ন সদৃশ আত্মায়, এই সংস্কারটি সংক্রামিত হয়। এভাবেই পরক্ষণের আত্মায় পূর্ব পূর্ব সকল ক্ষণের আত্মার অভিজ্ঞতার ফল বর্তায়। যখনই অনুকূল অবস্থার উৎপত্তি হয়, সেই ক্ষণে সৎ আত্মার নিহিত 'ফল' বা 'শক্তি' আত্ম প্রকাশ করে। এভাবেই স্মৃতিজ্ঞান হয়।

এভাবেই বৌদ্ধগণ কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদেরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কর্মের কর্তা আত্মা ও কর্মফল ভোগী আত্মা যেমন অভিন্ন নয়,

তেমনি তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নয়। কর্মকর্তা দ্বিতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন সদৃশ আত্মায়, কর্মকর্তার কর্মের ফলটি বর্তায়। এভাবে একটি সন্তানের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষণের আত্মায়, একটির পর অন্যটিতে, ক্রমিকভাবে কর্মকর্তার কর্মের ফলটি (পাপ-পূণ্য) বর্তায়।

জন্মান্তর প্রসঙ্গে বৌদ্ধগণ বলেন, প্রতি মুহূর্তেই মানুষের জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম ঘটছে। কারণ কোন একটি ক্ষণের মানুষ দ্বিতীয়ক্ষণে থাকে না। একটি 'সন্তান' রূপ মানুষের কর্মের ফল, লৌকিকভাবে কথিত 'মৃত্য'র সঙ্গে সঙ্গে, নতুন যে সন্তান আরম্ভ হয়, তার প্রথম ক্ষণের সন্ততিতে সংক্রামিত হয়। এভাবে, ধারাটি চলতে থাকে। কিন্তু পূর্বজন্মের আত্মা রূপ প্রথম সন্তানের পূর্ব পূর্ব ক্ষণের সন্ততির কর্মফল পরপর ক্ষণের সন্ততিতে বর্তায়। কিন্তু, পরজন্মের আত্মারূপ সন্তানের ধারাবাহিকতাটি পূর্বজন্মের আত্মা রূপ সন্তানের ধারাবাহিকতা থেকে ভিন্ন। দুটি সন্তানরূপ ধারাবাহিকতা ভিন্ন হলেও, তাদের মধ্যে একপ্রকার ধারাবাহিকতা থেকে যায়। একই সন্তানের পূর্বক্ষণের সন্ততির চরিত্র (character), প্রবণতা (Disposition) বা শক্তি (Potency) পরক্ষণের সন্তানে সংক্রামিত হয়। এভাবেই, প্রথম সন্তানের শেষক্ষণের সন্ততির চরিত্র, প্রবণতা বা শক্তি দ্বিতীয় সন্তানের প্রথম ক্ষণের সন্ততিতে বর্তায়। এভাবে দুটি ভিন্ন সন্তানের মধ্যে একপ্রকার ধারাবাহিকতা থাকা সম্ভব। এই যুক্তিতে জন্মান্তবাদ স্বীকার করলে কোন স্ববিরোধীতা ঘটে না। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের দ্বারাই পরজন্মটি নিয়ন্ত্রিত। এ সম্পর্কে বৌদ্ধ দার্শনিক বলেন, পূর্বজন্মের সন্তানের মধ্য দিয়ে সংক্রামিত চরিত্র, প্রবণতা বা শক্তির প্রভাবে পরজন্মের সন্তান উৎপন্ন হয়। এইভাবে, একটি সন্তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীকালীন নানা সন্তানের

উৎপত্তি ও বিনাশরূপ জন্ম ও জন্মান্তরের প্রবাহটি চলতে থাকে। মানুষ যতকাল নতুন জন্মলাভের বাসনাকে ('ভব') পুরোপরি জয় করতে না পারে, ততকালই এই প্রবাহ চলে।[13]

২। উদ্দ্যোতকর বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদের বিরুদ্ধে বলেন, 'আত্মা নেই' এরূপ বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত কোনরূপেই প্রতিপন্ন করা যায় না। বৌদ্ধদর্শনে বলা হয়েছে পঞ্চস্কন্ধের কোন একটি স্কন্ধ পৃথকভাবে আমি বা আত্মা নয়, কিন্তু পঞ্চস্কন্ধের সমুদায়ই আত্মা। উদ্দ্যোতকারের মতে, ঐ বাক্যের দ্বারা বিশেষভাবে আত্মার নিষেধ হলেও সামান্যত আত্মার নিষেধ হয়নি। পঞ্চস্কন্ধের সমুদায়ই আত্মা হলে অতিরিক্ত আত্মাই স্বীকৃত হয়, কেবল আত্মার নামভেদ মাত্র।[14]

৩। নৈয়ায়িকরা বলেন, ''আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে প্রমাণেরই অস্তিত্ব থাকে না। প্রমা বা যথার্থ অনুভবের করণই প্রমাণ। অনুভবিতা বা জ্ঞাতা না থাকলে প্রমারূপ অনুভব সম্ভবই হবে না।" সুতরাং প্রমাণ স্বীকার করলে অনুভবিতা আত্মা অবশ্যস্বীকার্য। আত্মা না থাকলে জ্ঞান সম্ভবই হবে না। কিন্তু জ্ঞান পদার্থ সকলেরই স্বীকার্য। জ্ঞানের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে কোন মত স্থাপন বা কোনরূপ তর্কই সম্ভব নয়। জ্ঞান যেহেতু সর্বসিদ্ধ পদার্থ সুতরাং ঐ জ্ঞানের আশ্রয়রূপে স্থায়ী জ্ঞাতাও সর্বসিদ্ধ পদার্থরূপে অবশ্য স্বীকার্য।[15]

৪। তাছাড়া স্থায়ী আত্মা বলে কোন পদার্থ না থাকলে নির্বাণের উপপত্তি হবে না। নিত্য আত্মা না থাকলে, কে নির্বাণ লাভ করবে? স্থায়ী, নিত্য আত্মা স্বীকার না করলে নির্বাণ মানুষের কাম্য হতে পারে না। সুতরাং নির্বাণ লাভের জন্য তপস্যা

---

[13] পূর্ববৎ, পৃঃ ৮৯-৯২।
[14] ন্যায়দর্শন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৩য় খন্ড পৃঃ ১০।
[15] পূর্ববৎ, পৃঃ ১২-১৩।

ও উপদেশাদির ও তখন আবশ্যিকতা থাকবে না। সুতরাং আত্মা সম্পর্কে বৌদ্ধমত সন্তোষজনক নয়।

সাংখ্য দর্শনে আত্মা সম্পর্কে কি বলা হয়েছে সেটিও এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ।

সাংখ্য ও যোগ দর্শনে আত্মার স্বরূপ

দ্বৈতবাদী সাংখ্যদর্শনে মূল তত্ত্ব দুটি - প্রকৃতি ও পুরুষ। সাংখ্য দর্শনে আত্মাকেই পুরুষ বলা হয়েছে। জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি জড় বা অচেতন এবং সদা পরিণামী। প্রকৃতি অচেতন বলে তার দ্বারাই সবকিছুর ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তাই সাংখ্য দর্শনে চেতন, অপরিণামী আত্মা বা পুরষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।[16] প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি, এবং প্রকৃতি নয়, বিকৃতিও নয়- এই চার প্রকার তত্ত্ব সাংখ্য দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে। পুরুষ প্রকৃতি ও নয়, বিকৃতিও নয়। 'ন প্রকৃতি ন বিকৃতিঃ পুরষঃ।'[17] পুরুষ কোন কিছুর কারণ নয়, কোন কিছুর বিকার বা পরিণামও নয়। পুরুষ অজ ও নিত্য। কিন্তু অন্য সব দিক থেকে পুরুষ প্রকৃতির বিপরীত। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকা গ্রন্থের ১১ নং কারিকায় বলেছেন-

"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি।

ব্যক্তং তথা প্রধানম্ তদ্বিপরিতস্তথা চ পুমান্।"

[16] সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শন, কনকপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২২।
[17] সাংখ্যকারিকা, কারিকা ৩।

অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত মহৎ প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থ ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্মী। পুরুষ তার বিপরীত। ত্রিগুণত্বাদি ধর্মগুলি চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের সাধর্ম নয়। ঐগুলি পুরুষের বৈধর্ম, কেননা ব্যক্ত ও অব্যক্তের ত্রিগুণত্বাদি ধর্ম পুরুষে কখন থাকে না।

অদ্বৈত বেদান্তীরা আত্মাকে চিদানন্দস্বরূপ বলেছেন। কিন্তু সাংখ্যকাররা বলেন চৈতন্য এবং আনন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ বলে এরা কখনও একই আত্মায় একসাথে থাকতে পারে না। আত্মা চিদ্স্বরূপ জ্ঞাতা, কিন্তু আনন্দ স্বরূপ নয়। জ্ঞানের বিষয় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু চৈতন্য স্বরূপ আত্মার কোন পরিবর্তন নেই। এই আত্মা কর্তাও নয়। আত্মা অজ, নিত্য, রাগ-বিরাগ, বিবিক্ত এবং বস্তু লালসা মুক্ত। পরিবর্তন, কর্তৃত্ব, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সমস্তই দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়েরই সম্ভব। আমরা অজ্ঞান জন্য আত্মাকে দেহ, মন বা ইন্দ্রিয় বলে ভুল করি এবং একে পরিবর্তনশীল কর্তা এবং সুখ দুঃখের অধীন বলে মনে করি। আত্মা নিত্য, ক্রিয়াবিহীন, অসঙ্গ, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, নির্গুণ, বিবেকী, ও অপ্রসবধর্মী(অপরিণামী)। পুরুষ জ্ঞান স্বরূপ, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যাদি রহিত কেবল দ্রষ্টা।

পুরুষ চেতন ও অবিষয় হওয়ায় সাক্ষী হয়। এজন্যই পুরুষ দ্রষ্টা। পুরুষ প্রকৃতির অবস্থাবিশেষ দর্শন করেও নিষ্ক্রিয় বা অপরিণামী থাকে, পুরুষ প্রকৃতির প্রতি উদাসীনই থাকে। এজন্যই সে সাক্ষী।[18]

পুরুষ ত্রিগুণাতীত। ব্যক্ত ও অব্যক্ত ত্রিগুণ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ – এই তিনটিকে গুণ বলা হয়। পুরুষের কোন গুণ নেই। পুরুষ নির্গুণ। ত্রিগুণাতীত

[18] সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ১৯১।

বা ত্রৈগুণ্যদি বিপরীত স্বভাব হওয়ায় পুরুষের স্বাক্ষীত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ্য, দৃষ্টাত্ব, অকর্তৃত্ব অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয় । এখানে সাংখ্যের সাথে ন্যায় দর্শনের বিরোধ রয়েছে। ন্যায় দর্শনে আত্মাকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলা হয়েছে।[19]

পুরুষ স্বরূপত নিত্যমুক্ত এবং বন্ধনহীন। সুতরাং যে বন্ধনহীন তার মুক্তির ধারণাও ভ্রম মাত্র। "ত্রৈগুণ্যের বিপরীত হওয়ায় জন্য পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধ হয়।" দুঃখের আত্যন্তিক অভাবরূপ কৈবল্য পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ।

সাংখ্য মতে এই পুরুষ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়। অনুমান প্রমাণের দ্বারা পুরুষ বা আত্মার আস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় ১৭ নং কারিকায় পাঁচটি হেতুর উল্লেখ করেছেনঃ-

" সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ।

পুরুষঃ অস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।"

সাংখ্য মতে কোন একটি কারণের দ্বারা কোন কার্য হয় না। জড় পদার্থ মাত্র- ই অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে কার্য করে। যে পদার্থ মিলিতভাবে কার্য করে তাকে সংঘাত বলা হয়। তাই জড় পদার্থকে সংঘাত বলা হয়। "যঃ যঃ সংঘাতঃ সঃ সঃ পরার্থ" – যে সব বস্তু সংঘাত তারা অপরের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে। শয়ন বা শয্যা, আসন, বসন প্রভৃতি পদার্থ সর্বদা অপরের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। এইরূপ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ দৃষ্টান্তের দ্বারা সংঘাতমাত্রের পরার্থত্ব সিদ্ধ হয় । প্রকৃতি থেকে আরম্ভ করে সকল পদার্থই যার সিদ্ধির জন্য মিলিত ভাবে কার্য করে তাই প্রকৃত্যাদি সংঘাত ব্যতিরিক্ত পুরুষ পদবাচ্য।

[19] পূর্ববৎ, পৃঃ ১৯১-১৯২।

এখানে আশঙ্কা হতে পারে যে, সংঘাত কখনও সংঘাত ভিন্নের প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। আমরা পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করে থাকি যে একটি সংঘাত অপর একটি সংঘাতের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। শয়ন, আসন, বসন, ভূষন, ভোজনাদি, সংঘাত শরীরের সংঘাতেরই প্রয়োজন সিদ্ধ করে তা আত্মা বা পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। আত্মার নিদ্রা, উপবেশন, আবরন, শোভা, ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রভৃতির যদি প্রয়োজন থাকত তাহলে শয়ন, আসন প্রভৃতি আত্মার প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারত। কিন্তু নিদ্রা, উপবেশনাদি শরীরেরই প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সুতরাং এই অনুমানের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। এই আশঙ্কা নিরাকরনের জন্যই কারিকায় বলা হয়েছে "ত্রিগুণাদি বিপর্যয়াৎ।" সংঘাত পদার্থ অপরের প্রয়োজন সাধন করে কিন্তু সেই অপর বলতে যদি শরীর, ইন্দ্রয় প্রভৃতিকে বোঝায় তাহলে শরীরাদিও সংঘাত বলে সেই সংঘাত বলে সেই সংঘাতের পরার্থতা প্রতিপাদনের জন্য পররূপে সংঘাত আন্তর কল্পনা করতে হবে। আবার সেই সংঘাতের পরার্থতা প্রতিপাদনের জন্য পুনশ্চ সংঘাত আন্তর কল্পনা করতে হবে। এইরূপ কল্পনা চলতে থাকলে অনবস্থা দোষ হবে। সুতরাং সংঘাত সংঘাত আন্তরের প্রয়োজন সাধন করে। অব্যক্ত মহৎ ইত্যাদি সংঘাতরূপ এবং ত্রিগুণাদি বৈশিষ্ট্যের বিপরীত- এই যুক্তিতে পুরুষের অসংঘাততত্ত্ব সিদ্ধ হয়েছে।

'অধিষ্ঠানাৎ' – প্রকৃতি মহৎ তত্ত্ব প্রতিক্ষণে পরিণামপ্রাপ্ত হচ্ছে। ঐ পরিণাম অহেতুক হতে পারে না। কেননা তাহলে গুণএয়ের অনন্ত প্রকারের তারতম্য উপপাদন হবে না। গুণএয় জড় বলে তা কখনও স্বয়ং ক্রিয়াশীল হতে পারে না। জড়ের অধিষ্ঠানরূপ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। আত্মা বা পুরুষ অধিষ্ঠান হওয়াতেই জড় সমূহের অনন্ত পরিণাম হয়ে থাকে। পুরুষের

সান্নিধ্য বা সম্বন্ধই প্রকৃতি প্রভৃতি পরিণামের হেতু। জড় পদার্থ চেতন সান্নিধ্য বশতই পরিচালিত হয়। চালক ব্যক্তি বা অশ্বের সান্নিধ্য বশত যেমন জড় রথ চলে তেমনি পুরুষের সান্নিধ্য বশত প্রকৃতি প্রভৃতির পরিণাম হয়। প্রকৃতি প্রভৃতির পরিণাম আছে, সুতরাং যার সান্নিধ্য বশত ঐ পরিণাম হয় সেই পুরুষকে অস্বীকার করা চলে না।

'ভোক্তৃভাবাৎ'- শব্দের অর্থ হল ভোক্তৃত্ব বশত অব্যক্ত ও ব্যক্ত সুখ-দুঃখ মহাত্মক হওয়ায় অচেতন। এজন্য ব্যক্ত অব্যক্তকে ভোগ করতে পারে না। অতএব একজন ভোক্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। বাচস্পতি বলেছেন যে- ঈশ্বরকৃষ্ণ 'ভোক্তৃভাব' পদের দ্বারা ভোগ্য সুখ দুঃখকে বুঝিয়েছেন। আর সুখ দুঃখ যদি ভোগ্য হয় অতিরিক্ত একজন ভোক্তা বা পুরুষ স্বীকার করতে হবে। ভোগ্য কখন ভোক্তা হতে পারে না। ভোক্তাকে হতে হবে সুখ দুঃখ মোহ থেকে ভিন্ন কিন্তু কোন কোন সাংখ্যাচার্য 'ভোক্তৃভাবাৎ'পদের অন্য অর্থ করেছেন। 'ভোক্তৃভাবাৎ' এই কথার অর্থ হল 'দ্রষ্টৃভাবাৎ' এই কথার অর্থ এই যে দৃশ্যের দ্বারা দ্রষ্টার অনুমান হয়। এই দ্রষ্টাই আত্মা বা পুরুষ।

'কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ' কৈবল্য জন্য পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। 'কৈবল্য' শব্দের অর্থ আতন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। যদি পুরুষ নামক তত্ত্ব স্বীকৃত না হয় তাহলে কৈবল্যের প্রবৃত্তি ব্যহত হয়। বুদ্ধি প্রভৃতির কৈবল্য সম্ভব নয়। এইজন্য বুদ্ধি প্রভৃতি থেকে অতিরিক্ত অদুঃখাত্মক পুরুষ অবশ্য স্বীকার্য।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাংখ্য মতে পুরুষ নিত্য মুক্ত। যে নিত্য মুক্ত শাস্ত্রের দ্বারা তার কৈবল্য প্রতিপাদন করলে ব্যাঘ্যাত দোষ

দেখা দেয়। যে সর্বদা মুক্ত, তার মুক্তির উপায় বলা নিস্প্রয়োজন। তাই পুরুষের অস্তিত্ব সাধক হেতুবাক্য কৈবল্যের প্রবৃত্তির উল্লেখ অসঙ্গতই হয়। আবার সাংখ্য দর্শনে পুরুষকে অকর্তা বলা হয়েছে। কিন্তু পুরুষকে ভোক্তা বলা হয়েছে। তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, পুরুষে ভোগ কর্তৃত্ব আছে। সুতরাং পুরুষকে আর অকর্তা বলা যায় না। ফলে পুরুষের অস্তিত্ব সাধক যুক্তিগুলি খুব সুদৃঢ় নয়।

যদিও সাংখ্য দার্শনিকগণ এর উত্তরে বলেন, প্রকৃতির সাথে সংযোগের ফলে আত্মা কর্তা, জ্ঞাতা ও ভোক্তারূপে প্রতিভাত হয় মাএ। স্বরূপত পুরুষ জ্ঞাতা কর্তা বা ভোক্তা নয়।

সাংখ্য মতে পুরুষ এক নয় বহু। জীব দেহে যেহেতু বহু সেহেতু পুরুষও বহু। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় ১৮ নং কারিকায় বহু পুরুষবাদ প্রমাণ করার জন্য তিনটি হেতুর উল্লেখ করেছেন -

“জনম মরণ করণানাং প্রতিনিয়মাৎ অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।

পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াৎ চৈব।”

এখানে প্রথম হেতু হল ‘জনম মরণ করণানং প্রতিনিয়মাৎ’ – ‘জনম’ শব্দের অর্থ জন্ম। ‘মরণ’ শব্দের অর্থ মৃত্যু। ‘করণ’ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় বা অন্তকরণ। আর ‘প্রতিনিয়ম’ শব্দের অর্থ ব্যবস্থা। যুক্তিটি এই যে, প্রত্যেক পুরুষের জন্ম, মৃত্যু ও অন্তকরণাদি (নিয়ম) পৃথক পৃথক হওয়ায় পুরুষের বহুত্ব অবশ্য স্বীকার করতে হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে পুরুষ তো নিত্য আর যা নিত্য তার আবার জন্ম মৃত্যু কি? এইজন্য জন্ম মৃত্যুর অন্য অর্থ করা হয়েছে। শস্ত্রকার বলেছেন যে- দেহ,

ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে পুরুষের যে অভিসম্বন্ধ হয় তাই জন্ম আর ঐ সম্বন্ধ হওয়ার পর ওগুলির পরিত্যগকে বলে মৃত্যু। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যু এখানে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশকে নির্দেশ করে না। সকল শরীরে পুরুষ স্বীকৃত হলে, একজনের জন্ম বা মৃত্যু হলে সকলের জন্ম বা মৃত্যু স্বীকার করতে হবে, একজন অন্ধ হলে সকলের অন্ধত্ব স্বীকার করতে হবে।

এক্ষেত্রে অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আকাশ যেমন একটি পদার্থ হলেও ঘট, পট ইত্যাদি উপাধি ভেদের জন্য আকাশের ভেদ ব্যবহার হয়। এবং একটির উৎপত্তি হলেও অপরটির উৎপত্তি নাও হতে পারে। তেমনি আত্মা বা পুরুষ একটি হলেও দেহাদি উপাধী ভেদ বশতঃ ভিন্নরূপে ব্যবহার হয়। এর উত্তরে বাচস্পতি বলেন যে, উপাধি ভেদের জন্য আত্মাতে ভেদ ব্যবহার এবং জন্ম মৃত্যু স্বীকার করলে একই দেহের হস্তপদাদিকে ও উপাধি বলতে হয়। আর সেজন্য একই শরীরের বহু আত্মা স্বীকার করতে হবে কিন্তু এরূপ স্বীকার করা যায় না। সুতরাং দেহভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন স্বীকার করাই শ্রেয়।

“অযুগপৎ প্রবৃত্তেঃ” যেমন সকল শরীরে আত্মা এক হলে একের জন্ম মৃত্যুতে এবং করণ ব্যাপারে সকলে জন্ম মৃত্যুও করণ ব্যাপার হত। তেমনই একের প্রবৃত্তি হলে সকলের সেই সময়েই প্রবৃত্তি হত। কিন্তু তা হয় না। একে যখন ভোগের জন্য প্রযত্নবান হয় অন্যে তখন ত্যাগের প্রযত্ন করে। এই অযুগপৎ প্রবৃত্তির প্রতি শরীরে পুরুষ ভেদ স্বীকার করতে হবে।

‘ত্রৈগুণ্য বিপর্যয়াৎ’- ‘ত্রৈগুণ্য’ শব্দের অর্থ তিনটি গুণের ভাব। আর ‘বিপর্যয়’ শব্দের অর্থ অন্যথাত্ব বা বৈচিত্র্য। আমাদের যে দেবতা, মানুষ

এবং পশু পাখির জ্ঞান হয় তাদের মধ্যে এক এক প্রকারের এক এক রকম গুণের প্রাধান্য দেখা যায় যেমন দেবতাদের মধ্যে সত্ত্ব গুণের, মানুষের মধ্যে রজঃ গুণের এবং পশু পাখিদের মধ্যে তমঃ গুণের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু দেবতা, মানব, পশু প্রভৃতির আত্মা যদি একই হয় তাহলে ঐ প্রকার ভেদ ব্যবহার উৎপন্নই হতে পারে না। সুতরাং পুরুষের বহুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে বহুপুরুষ বাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা এক। একই আত্মা দেহাদি উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। উপাধির ভেদের দ্বারাই জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির প্রতিনিয়ম ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং বহুপুরুষবাদ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

তবে, বাচস্পতি মিশ্র এই আপত্তির উত্তর প্রসঙ্গে বলেন, পরিবর্তন যদি দেহাদির বা মৃত্যুর স্বরূপ হয় তাহলে হস্ত, পদ প্রভৃতির নাশ কে ও মৃত্যুকে আত্মার জন্ম ও মৃত্যু বলতে হয়। কিন্তু তা বলা যায় না। উপাধি ভেদে আত্মার ভেদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রতি শরীরে আত্মা ভিন্ন এটাই স্বীকার্য।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মার স্বরূপ

শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী, তাঁর মতে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ অর্থাৎ সত্তা এক ও অদ্বিতীয়। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের মূল কথা হল – ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন (“ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ”)।[20] অদ্বৈত দর্শনে ব্রহ্মকে একমাত্র সৎ বলে মনে করা হয়েছে, ব্রহ্ম ভিন্ন সকল কিছুই মিথ্যা।

[20] ভারতীয় দর্শন, দীপক কুমার বাগচী, প্রগতিশীল প্রকাশক ২০০৮, পৃঃ ২৮৬।

বেদান্তপরিভাষাকার ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র ব্রহ্মের দুটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। একটি স্বরূপ লক্ষণ অপরটি হল তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপই যেখানে লক্ষণ তাকে স্বরূপ লক্ষণ বলা হয়। "ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ"- এই শ্রুতিবাক্যে সত্যত্ব প্রভৃতি স্বরূপ লক্ষণ, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। সত্য, জ্ঞান, অনন্ত প্রভৃতি ধর্মদ্বারা ব্রহ্ম পরিচিত হন, কিন্তু এই ধর্মগুলি ব্রহ্ম থেকে অতিরিক্ত নয় এগুলি ব্রহ্ম স্বরূপ।

কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন, ধর্ম ধর্মীয় লক্ষণ হয়। যেমন-গোত্ব গো এর লক্ষণ হয়। কিন্তু ব্রহ্মের কোন ধর্ম না থাকায় সত্যত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের ধর্ম হতে পারে না। সুতরাং সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মের লক্ষণ ও প্রদান করা যায় না। এর উত্তরে বেদান্তীগণ বলেন, ব্রহ্মের কোন ধর্ম না থাকলেও ধর্মী ধর্মভাব কল্পনা করতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। বাস্তবিক সত্যত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ব্রহ্ম থেকে এগুলি অভিন্ন কিন্তু ব্রহ্মকে ধর্মী ও সত্যত্ব প্রভৃতিকে ধর্ম বলে কল্পনা করা যায়। এই কল্পনা বশতঃই বেদান্তীগণ সত্যত্ব প্রভৃতিকে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলেছেন।

ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ ও প্রদান করা হয়েছে। যা লক্ষ্যের স্বরূপের অন্তর্গত নয় অথচ ইতর ব্যাবর্তক তাই হল তটস্থ লক্ষণ। অর্থাৎ সহজ ভাষায় বললে বলতে হয় যতকাল লক্ষ্য বস্তু অবস্থান করে ততকাল না থেকে যে ধর্ম লক্ষ্যকে অপর পদার্থ থেকে ব্যাবৃত্ত করে তাই হল তটস্থ লক্ষণ। যেমন গন্ধবত্ত্ব হল পৃথিবীর তটস্থ লক্ষণ। যেহেতু উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে ঘটাদি পৃথিবীতে গন্ধ না থাকলেও গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীকে জলাদি থেকে ব্যাবৃত্ত করে। সেই রকম জগদ্-জন্মাদি কারণত্ব হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। যেহেতু জগজ্জন্ম কারণত্ব,

জগদ্‌স্থিতি কারণত্ব, জগদ্‌লয় কারণত্ব সর্বকালে ব্রহ্মে না থাকলেও ব্রহ্মকে অপর পদার্থ থেকে ব্যাবৃত্ত করে বলে উহারা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। আবার জগৎ উপাদানত্ব অর্থাৎ জগৎ অধ্যাসের অধিষ্ঠানত্বকেও ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ বলা যায়।

শঙ্করাচার্য এই ব্রহ্মকে চরম সত্তা বলেছেন। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, 'শুদ্ধজ্ঞান' 'শুদ্ধচৈতন্য', 'ব্রহ্ম', 'আত্মা' প্রভৃতি সমার্থক শব্দ। আত্মা, চৈতন্য, ব্রহ্ম অভিন্ন। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আত্মা। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, যা বাধিত হয়, তাই মিথ্যা; যা অবাধিত তাই চিরস্থায়ী ও সত্য। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় বা সমাধি এই চারপ্রকার অভিজ্ঞতাতেই চৈতন্যের অনুবৃত্তি বা চৈতন্য বর্তমান থাকায় আত্মা এই সকল অভিজ্ঞতাতেই অবাধিত। সুতরাং আত্মা কোন অভিজ্ঞতাতেই বাধিত না হওয়ায় আত্মাই চরম সত্তা। শঙ্করাচার্যের মতে, ব্রহ্মে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত কোন ভেদই নেই। একই জাতির অন্তর্গত দুটি বস্তুর মধ্যে যে ভেদ তা হল সজাতীয় ভেদ। দুটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর যে ভেদ তা বিজাতীয় ভেদ। ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, তাই ব্রহ্মে বা আত্মায় সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ থাকতে পারে না। একই বস্তুর অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে ভেদ তা স্বগত ভেদ। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ হওয়ায় নিরংশ বা নিরবয়ব। সুতরাং ব্রহ্মে স্বগত ভেদ নেই। সজাতীয়, বিজাতীয়, ও স্বগত ভেদরহিত ব্রহ্মই একমাত্র সৎ।[21] অন্তঃকরণ ভেদের ফলেই জীব ভেদ ঘটে। আত্মাতে অন্তঃকরণ রূপ অনাত্মার অধ্যাসের ফলে এক ও শুদ্ধ আত্মা বহুরূপে প্রতিভাত হয়।

স্বয়ংসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ আত্মা,- স্বপ্রকাশ। আত্মার সত্তা ও প্রকাশ অভিন্ন। শ্রুতিতে আত্মাকে 'স্বয়ং জ্যোতি' বলা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে

[21] পূর্ববৎ, পৃঃ ২৮৭।

আত্মাকে স্বপ্রকাশ বলা হয়েছে কেননা, তাঁদের মতে যদি আত্মা পরপ্রকাশ স্বরূপ হয় তাহলে অনবস্থা দোষ ঘটে। যদি আত্মা অন্যের দ্বারা প্রকাশ হয়, তাহলে আত্মপ্রকাশককে প্রকাশ করার জন্য অন্য প্রকাশক মানতে হয়। এভাবে, অবিরল প্রকাশ ধারা মানতে হয়। এই ধারা অন্তহীন। সুতরাং এই অনবস্থা দোষ নিরাকরণের জন্য আত্মা স্বপ্রকাশ মানতেই হয়। তাছাড়া আত্মাকে স্বপ্রকাশ না মানলে জাগতিক সমস্ত প্রমাণ ও প্রমেয়ের ব্যবহার অসম্ভব হয়। আত্মা সকল প্রমাণের আশ্রয়। প্রমাণ ছাড়া প্রমেয়ের ব্যবহার হতে পারে না। তাই অদ্বৈত বেদান্তীগণ বলেন, সকল প্রমাণ ও ব্যবহারের আশ্রয় আত্মা, প্রমাণ ও ব্যবহারের পূর্বেই স্বতঃপ্রমাণিত হতে পারে। তাই আত্মাকে স্বপ্রকাশ মানতেই হয়।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে, আত্মা কোন জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না, আত্মা হল শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র যা শ্রুতিগম্য, সকল প্রমাণের অগম্য।

জীব ও ব্রহ্মকে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে অভিন্ন বলা হয়েছে। তাই শঙ্করাচার্য জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদনের জন্য বলেন, ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, জীব ও চৈতন্যস্বরূপ। স্বরূপত জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। অনাদি অজ্ঞান বা অধ্যাসের জন্যই জীব নিজেকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাসের কারণ হল অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ নিস্ক্রিয় হলে, আত্মা শুদ্ধজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অদ্বৈত বেদান্ত মতে, অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় নয়; অন্তঃকরণ হল অবিদ্যার কার্য এবং এটি অনিত্য। নৈয়ায়িকগণ মানস প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। এই মানস প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষস্বরূপতা উপপাদনের জন্য ইন্দ্রিয় স্বীকার করা দরকার। তাই, তারা অন্তঃকরণকে ইন্দ্রিয় বলেন। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত মতে, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি

অন্তঃকরণের পরিণাম। এই সুখ, দুঃখ বহিরিন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ ব্যতীত তারা আত্মার কাছে প্রকাশিত হয়। তাই অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় নয়। তাছাড়া অদ্বৈত বেদান্তীগণ বলেন, শ্রুতিবাক্যে ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রুতিতে বলা হয়েছে 'ইন্দ্রিয় থেকে অর্থ শ্রেষ্ঠ, অর্থ থেকে অন্তঃকরণ শ্রেষ্ঠ।' এতে প্রমাণিত হয় যে, অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন। অনাত্মা বা শরীর আত্মার মতোই জীবে বর্তমান থাকে। তবে শরীর মিথ্যা। শরীর তিন প্রকার – স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূল শরীর চারপ্রকার – জরায়ুজ, অন্তজ, স্বেদজ ও উদ্ভজ্জ। সূক্ষ্ম শরীর সতেরটি অবয়বের দ্বারা গঠিত। এই সতেরটি অবয়ব হল – পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, আপন, ব্যান, উদান, সমান), বুদ্ধি ও মন।[22] স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ – এই তিন প্রকার শরীরই মায়ার দ্বারা সৃষ্ট। শরীর মায়া দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় অনিত্য ও মিথ্যা। অনাদি অজ্ঞানের জন্যই আত্মাতে অনাত্মার একীকরণ হয় এবং জীবের আবির্ভাব হয়। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম হলেও অজ্ঞানের জন্য জীব তার স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং নিজেকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। এই অবস্থায় জীব নিজেকে সসীম শরীর, অন্তঃকরণ থেকে অভিন্ন বলে মনে করে। আত্মাতে অন্তঃকরণের অধ্যাসের ফলেই জীব নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। এবং তখনই 'আমি জানি', 'আমি ভোগ করি', 'আমি করি' ইত্যাদি ব্যবহার হয়। বস্তুত আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা নয়। কিন্তু, আত্মাতে অন্তঃকরণ নামক অনাত্মার অধ্যাসের ফলেই ব্যবহারিক ভাবে আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারূপে প্রতিভাত হয়। আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা বা ভোক্তা হতে পারে না কারণ –

[22] ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্ররচিত বেদান্ত পরিভাষা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৪, পৃঃ ১০০।

ব্যবহারিক জ্ঞান কিংবা অন্য বিশেষ মানস ব্যাপার-গুণ-গুণী, ধর্ম-ধর্মী, জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্ম-কর্তা, ভোক্তা-ভোগ্য প্রভৃতি ভেদজন্য। কিন্তু আত্মা সকল প্রকারের ভেদ রহিত। যা কিছু ভেদজন্য, তাই বিশেষ ও সসীম কিন্তু আত্মা সর্বদাই অসীম। তাছাড়া, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি (গুণ), অবিদ্যা প্রসুত ভেদ। ভেদ মাত্রই অভাবজনক। অভাব থেকেই দুঃখ জন্মায়। কর্তৃত্ব প্রভৃতি দুঃখ স্বরূপ। তাই চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ আত্মার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম থাকতে পারে না।

শঙ্করের মতে, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি উপনিষদের বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ ঘোষনা করা হয়েছে। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' শব্দের দ্বারা নির্গুন ব্রহ্ম এবং 'ত্বম্' শব্দের দ্বারা জীবাত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই 'তৎ' ও 'ত্বম্' অভিন্ন। শঙ্করাচার্য জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদনের জন্য 'তৎ' ও 'ত্বম্' শব্দের লক্ষণা করেছেন। যখন কোন পদের মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ (primary meaning) গ্রহণ করে বাক্যের তাৎপর্য নিরূপন করা যায় না। তখন ঐ পদের লক্ষণা করে অন্য অর্থ (secondary meaning) গ্রহণ করা হয়। লক্ষণা তিন প্রকার জহৎ লক্ষণা, অজহৎ লক্ষণা, এবং জহৎ-অজহৎ লক্ষণা। যে লক্ষণায় পদের বাচ্যার্থ বা শক্যার্থের একাংশ পরিত্যক্ত হয় এবং একাংশ গৃহীত হয় তাকে জহৎ-অজহৎ লক্ষণা বলে। একথা ঠিক যে, সর্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্তা ও অল্পশক্তিমত্তা পরস্পর বিরুদ্ধ, কিন্তু চৈতন্য অংশে 'তৎ' ও 'ত্বম্' অভিন্ন। শঙ্করাচার্য এখানে 'তৎ' শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ চৈতন্যকে এবং 'ত্বম্' পদের দ্বারা জীবের স্বরূপ চৈতন্যকে বুঝিয়েছেন। এক্ষেত্রে 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের বাচ্যার্থের একাংশ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং একাংশ বাক্যার্থে অন্বিত হয়েছে। শঙ্কর

জহৎ-অজহৎ লক্ষণার দ্বারাই 'তত্ত্বমসি' বাক্য যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদক তা দেখিয়েছেন। শঙ্করের মতে, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ তা ব্যাবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকেই জীব ব্রহ্ম থেকে নিজেকে ভিন্ন বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে জীব মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে জীবাত্মার পৃথক কোন সত্তা নেই, জীব ব্রহ্ম স্বরূপ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, জীব যদি ব্রহ্ম স্বরূপ হয়, তাহলে জীব কেন বারবার দেহযুক্ত হয়ে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে? এর উত্তরে শঙ্কাচার্য বলেন, জীব স্বরূপত ব্রহ্ম হলেও অনাদি অজ্ঞানবশতই আত্মা ও অনাত্মার বা দেহের সংযোগ ঘটে। অনাদি মায়া বা অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে জীব নিজের স্বরূপ অর্থাৎ জীব ব্রহ্মই এই স্বরূপ বিস্মৃত হয়। এবং জীব তখন নিজেকে জন্ম মৃত্যর অধীন বলে মনে করে। তখনই জীব দুঃখে পীড়িত হয়।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আত্মা যেহেতু নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত তাই মোক্ষ লাভের প্রয়োজনীয়তা কী? উত্তরে বলা যায়, এরূপ প্রশ্ন অবান্তর। ক্ষীরমিশ্রিত জলে যেমন ক্ষীর ও জল পৃথকভাবে নিজস্বরূপে উপলব্ধ হয় না, ঠিক তেমনি আত্মা অনাদি মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত রূপে প্রতীত হওয়ায় আত্মা নিজ স্বরূপে উপলব্ধ হয় না।[23] তাই মোক্ষ লাভের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শঙ্করের মতে, অবিদ্যার নিবৃত্তি হলে জীব মুক্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষানুভব হলে অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি ঘটে

[23] সায়ণমাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, অনু., সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩৪।

এবং জীব তার ব্রহ্মস্বরূপকে জানতে পারে। অর্থাৎ জীব যে ব্রহ্মস্বরূপ তার প্রকাশ হয়। ফলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। একেই মোক্ষ বা মুক্তি বলে।[24]

প্রথম আধ্যায়ের ন্যায় দ্বিতীয় আধ্যায়েও বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের মতগুলি পর্য্যালোচনা করে দেখা গেল যে, কোনটিই সন্তোষজনক নয়। কেন এই মতবাদ গুলি সন্তোষজনক নয় তা আমরা তৃতীয় আধ্যায়ে দেখব ।

[24] বেদান্ত পরিভাষা, অনু., পঞ্চানন শাস্ত্রী, ১৩৭৭, পৃঃ ৩২১।

তৃতীয় অধ্যায়

ন্যায় মত স্বীকৃত আত্মার স্বরূপ

ন্যায় দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায় সূত্র' গ্রন্থের প্রথম সূত্রে ষোলটি মোক্ষপযোগী পদার্থের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে প্রমেয় একটি অন্যতম পদার্থ। মহর্ষি গৌতম প্রমেয় পদার্থ গুলির উল্লেখ করে বলেছেন-

"আত্ম- শরীরেন্দ্রিয়ার্থ- বুদ্ধি- মনঃ- প্রবৃত্তি- দোষ- প্রেত্যভাব- ফল- দুঃখাপবর্গাস্ত প্রমেয়ম্।।" ন্যা. সূঃ ১/১/৯

এই দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে আত্মার উল্লেখই সর্বপ্রথম করা হয়েছে কেননা মোক্ষ বা অপবর্গ জীবাত্মারই পরম পুরুষার্থ। এই আত্মার অস্তিত্ব সাধক লিঙ্গ প্রকাশ দ্বারা আত্মার লক্ষণ সূচনা করতে গৌতম বলেছেন-

'ইচ্ছা- দ্বেষ- প্রযত্ন- সুখ- দুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গং' ন্যা. সূঃ ১/১/১০

অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ ও জ্ঞান - আত্মার লিঙ্গ (অনুমাপক) এবং লক্ষণ। তাৎপর্য এই যে, উক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি গুণের দ্বারা অনুমাণ প্রমাণ সিদ্ধ যে, ঐ সমস্ত গুণের আশ্রয় আছে। পরে ঐ ইচ্ছাদি যে, দেহাদির গুণ নয়- তা অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় দেহাদি ভিন্ন আত্মা অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হয়। অবশ্য 'আমি সুখী', 'আমি দঃখী' ইত্যাদি প্রকারের মনোগ্রাহ্য সুখ দুঃখাদি গুণের মানস প্রত্যক্ষ কালে সমস্ত জীবই নিজ নিজ আত্মার মানস প্রত্যক্ষ করে। তবে সেক্ষেত্রে অল্পজ্ঞ কোন জীবই আত্মাকে দেহ থেকে ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ

করতে পারে না। তাই মহর্ষি কণাদ ও জীবাত্মাকে অপ্রত্যক্ষ বলেছেন এবং আত্মাকে অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ বলেছেন।[25]

কিন্তু এখানে আত্মার লক্ষণ প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার গৌতম "ইচ্ছা- দ্বেষ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ইচ্ছাদি বিশেষ গুণকে আত্মার লক্ষণরূপে ও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ হল আত্মার অসাধারণ ধর্ম। তাই ইচ্ছাবত্ত্ব, জ্ঞানবত্ত্ব প্রভৃতি আত্মার লক্ষণ।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ও পূর্বোক্ত সূত্রে "লিঙ্গ" শব্দের দ্বারা লক্ষণ অর্থই গ্রহণ করে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ইচ্ছা প্রভৃতি ঐ সমস্ত গুণ আত্মার লক্ষণ। এরমধ্যে ইচ্ছাবত্ত্ব, প্রযত্নবত্ত্ব, জ্ঞানবত্ত্ব- এই তিনটি জীবাত্মা ও পরমাত্মার উভয়েরই লক্ষণ। কারণ- পরমাত্মাতে ও নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন ও নিত্য জ্ঞান আছে। এবং দ্বেষবত্ত্ব, সুখবত্ত্ব ও দুঃখবত্ত্ব কেবল জীবাত্মারই লক্ষণ। যদিও কেউ কেউ পরমাত্মার ও নিত্যসুখ স্বীকার করেছেন।[26]

বৈশেষিক দর্শনেও অনিত্য জ্ঞানের আধার যে দ্রব্য, তাকে জীবাত্মা বলা হয়েছে। আমাদের ঘট, পট ইত্যাদির জ্ঞান হয়। জ্ঞান হল গুণ পদার্থ। গুণ মাত্রই কোন না কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। কাজেই ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি ও কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করেই উৎপন্ন হয়। যে দ্রব্যকে আশ্রয় করে এই জ্ঞান- গুণ উৎপন্ন হয়, তাই হল জীবাত্মা। এখানে উল্লেখ্য যে, জীবাত্মার দুরকমের গুণ থাকে- সামান্য গুণ ও বিশেষ গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ প্রভৃতি হল জীবাত্মার সামান্য গুণ। এই গুণগুলি

[25] ন্যায় পরিচয়, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃঃ ১৮৩।

[26] পূর্ববৎ, পৃঃ ১৮৪।

আত্মা ছাড়া অন্য দ্রব্যেও আছে। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার হল জীবাত্মার বিশেষ গুণ। এই গুণগুলি আত্মা ছাড়া অন্য দ্রব্যে থাকে না। ন্যায়- বৈশেষিক দর্শনে সাধারণত এই বিশেষ গুণগুলির মধ্যে জ্ঞান গুণের আশ্রয়ত্বকেই আত্মার লক্ষণ বলা হয়।[27]

চার্বাক দার্শনিকগণ বলেন, জ্ঞান- গুণের আশ্রয় রূপে আত্মা বলে কোন দ্রব্য স্বীকারের প্রয়োজন নেই; শরীরই জ্ঞানের আশ্রয়। কাজেই শরীরই আত্মা। শরীর ভৌতিক দ্রব্য তাই তা জ্ঞান- গুণের আশ্রয় হতে পারে না। তাছাড়া, জ্ঞান যদি শরীরের গুণ হত, তাহলে মৃত শরীরেও জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারত। কিন্তু মৃত শরীর জ্ঞানহীন। আবার, শরীর জ্ঞান- গুণের আশ্রয় হলে, বাল্যে অনুভূত পদার্থের বার্ধক্যে স্মরণ হওয়া সম্ভব হত না। অনুভব কর্তারই স্মৃতি হয়- এটা মানতে হয়। বাল্যের যে অনুভব, তার আশ্রয় যদি বাল্যের শরীর হয়, তাহলে বার্ধক্যে সেই শরীর থাকে না বলে, ঐ অনুভব জনিত স্মৃতি ও সম্ভব হয় না।

এর উত্তরে চার্বাকদের বক্তব্য এই যে, বাল্যকালীন শরীর এবং বৃদ্ধকালীন শরীর ভিন্ন হলেও তা একই দেহ সংক্রান্ত হওয়ায় বাল্যকালীন শরীরে দর্শন জন্য উৎপন্ন সংস্কার বৃদ্ধকালীন শরীরে সংক্রামিত হয়। ফলে বৃদ্ধকালীন শরীর ও বাল্যের অনুভব স্মরণ করতে পারে।

কিন্তু চার্বাকদের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকগণ বলেন, সংস্কারের গতিক্রিয়া নেই তাই তা একদেহ থেকে অন্যদেহে সংক্রামিত হতে পারে না। যদি সংস্কার গতিশীল হত তাহলে মায়ের সংস্কার ও গর্ভস্থ শিশুতে সংক্রামিত হত কিন্তু বাস্তবে তা হয় না।

---

[27] ন্যায় বৈশেষিক দর্শন, করূণা ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ৪৩।

প্রত্যুত্তরে চার্বাকগণ বলেন যে, উপাদান- কারণ যে শরীর, তদ্‌গত সংস্কারই তার কার্যরূপ অন্য শরীরে সংক্রামিত হয় এটাই নিয়ম।

কিন্তু একথাও বলা যায় না। কারণ, বাল্যকালীন শরীর বহুপূর্বে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায় তা কখনই বৃদ্ধাকালীন শরীরের উপাদান-কারণ হতে পারে না। সুতরাং স্মৃতি দেহেরই গুণ, দেহই আত্মা, একথা বলা যায় না।

তাছাড়া, চৈতন্য বা জ্ঞান যে, শরীরের বিশেষ গুণ নয় অর্থাৎ শরীরই জ্ঞাতা বা আত্মা নয়- এর সমর্থনে মহর্ষি গৌতম বলেছেন-

"যাবচ্ছরীর ভাবিত্বাদ্রূপাদীনাম্।।" ন্যা. সূঃ ৩/২/৪৭

অর্থাৎ যতকাল শরীর বিদ্যমান থাকে ততকাল তাতে রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষ গুণ ও বিদ্যামান থাকে। অতএব জ্ঞান যদি শরীরের বিশেষ গুণ হয় তাহলে শরীর বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত তাতে জ্ঞান ও বিদ্যমান থাকবে। শরীর কখন ও জ্ঞানরূপ বিশেষ গুণ- শূণ্য হতে পারবে না। কিন্তু শরীর বিদ্যমান থাকলেও কোন কোন সময়ে যেমন- সুষুপ্তিকালে তাতে কোন জ্ঞানই থাকে না। অতএব জ্ঞান শরীরের বিশেষ গুণ নয়।[28]

তবে চার্বাকগণ বলেন যে, শরীরের সমস্ত বিশেষ গুণই রূপাদির ন্যায় শরীরাস্থিতি পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকবে- এইরকম কোন নিয়ম নেই। শরীরের সমস্ত গুণ একজাতীয় নয়। সুতরাং শরীরে অস্থায়ী বিশেষ গুণ ও থাকতে পারে। তাই মহর্ষি গৌতম পরে আবার বলেছেন-

"শরীরব্যাপিত্বাৎ।।" ন্যা. সূঃ ৩/২/৫০

[28] ন্যায়পরিচয়, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃঃ ২৫-২৬।

অর্থাৎ শরীরব্যাপী, শরীরের সর্ব্বাংশেই জ্ঞান জন্মায়। সুতরাং জ্ঞান শরীরেরই বিশেষগুণ- এটা বলা যায় না। তাৎপর্য এই যে যদি শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিতে জ্ঞান জন্মায় তাহলে সেই সকল অবয়বকেই, জ্ঞান আধার ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা বা আত্মা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু হস্তপদাদি ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব গুলি সমস্তই পৃথক পৃথক আত্মা এটা প্রমাণ সিদ্ধ নয়। বরং যে আমি হাতের দ্বারা স্পর্শ করছি, সেই আমিই চোখের দ্বারা দর্শন করছি, সেই আমিই কানের দ্বারা শুনছি এইরূপ বোধই আমাদের হয়। এর থেকে বোঝা যায় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কর্তা এক। প্রত্যেক শরীরেই বহু আত্মা স্বীকার করলে কোন কার্যই সম্পন্ন হতে পারে না। কারণ, বহু আত্মার মধ্যে ঐক্যমত থাকতে পারে না। তাছাড়া যদি একটি শরীরে হস্তপদাদি ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলা হয় তাহলে কোন ব্যাক্তির হস্ত ছিন্ন হলে সে আর তা স্মরণ করতে পারে না। কেননা, তখন সেই পূর্বোৎপন্ন প্রত্যক্ষের কর্তা সেই হস্ত আর থাকে না।

শরীরেই জ্ঞান জন্মায় চার্বাকদের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আরো বলা যায়, শরীরই জ্ঞানের আধার একথা বললে সেই শরীর নির্বাহক মূল পরমাণুতেও চৈতন্য বা জ্ঞান স্বীকার করতে হয়। কারণ, মূল পরমাণুতে চৈতন্য না থাকলে তার কার্যরূপ শরীরে চৈতন্য বা জ্ঞান জন্মাতে পারে না। কিন্তু চতুর্ভূতের পরমাণুতে চৈতন্য থাকে না- এটা চার্বাকরাও মানেন। সুতরাং শরীরেই চৈতন্য বা জ্ঞান জন্মায়, শরীরই জ্ঞাতা আত্মা, একথা স্বীকার করা যায় না।

পূর্বপক্ষীগণ বলতে পারেন, যে সমস্ত যুক্তির দ্বারা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় ও শরীর থেকে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় সেই সমস্ত যুক্তির দ্বারা, চিরস্থায়ী নিত্য মনেরই আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। এই মন নামক অন্তর ইন্দ্রিয় জ্ঞানের

আশ্রয় হতে পারে। যেকোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হতে গেলেই মনের সহায়তা প্রয়োজন হয় তাছাড়া মন নিত্য হওয়ায়, তা বিনষ্ট হয় না। সুতরাং মনই জ্ঞানগুণের আশ্রয় আত্মা হতে পারে এবং তাহলে তখন স্মৃতির ব্যাখ্যা দিতে ও কোন অসুবিধা হয় না।

পূর্বপক্ষীদের যুক্তি খন্ডনের উদ্দেশ্যে মহর্ষি গৌতম বলেছেন-

"জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্।।" ন্যা. সূঃ ৩/১/১৬।

অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানেরই সাধন বা কারণ আছে। জ্ঞাতা বা কর্তা কারণের দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন। নচেৎ কোন জ্ঞানই জন্মাতে পারে না। সুতরাং মন যদি জ্ঞাতা হয় তাহলে মনের সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষের কোন করণ অবশ্য স্বীকার্য এই করণ কে হবে? মন জ্ঞাতা হলে তাতো আর করণ হতে পারে না। কারণ, কর্তা ও করণ ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং মন জ্ঞাতা হলে সুখ দঃখাদি ভোগের করণ রূপে পৃথক কোন অন্য নামের অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকার করতে হয়। এরূপ হলে নামভেদমাত্র হয়, পদার্থের কোন ভেদ হবে না। কারণ এক্ষেত্রে সুখ দুঃখাদি ভোগের কর্তা এবং তার করণ পৃথকরূপে স্বীকৃত হয়েছে ফলে, মনকে জ্ঞাতা বলা যায় না।

পূর্বপক্ষীরা বলতে পারেন, জ্ঞাতার বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষেই করণ আছে? কিন্তু সুখ- দুঃখাদির প্রত্যক্ষে কোন কারণ নেই। সুতরাং মনকে জ্ঞানের কর্তা বলতে কোন অসুবিধা নেই।

বাহ্যবিষয়ে প্রত্যক্ষে চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয় করণ, কিন্তু সুখ-দুঃখাদি প্রত্যক্ষের কোন করণ নেই- একথা স্বীকার করা যায় না। বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষের ন্যায় সুখ- দুঃখাদির প্রত্যক্ষেরও করণ অবশ্য আছে- এটা অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ। সেই করণই হল মন। সুতরাং মন জ্ঞাতা বা কর্তা হতে পারে

না। তাছাড়া, ‘আমি মনের দ্বারা সুখ অনুভব করছি’, ‘আমি মনের দ্বারা দুঃখ অনুভব করছি’- ইত্যাদি প্রকার মানস- প্রত্যক্ষের পরে মনকে জ্ঞাতা থেকে ভিন্ন বলেই বোঝা যায়।

মন যে জ্ঞান কর্তা বা আত্মা হতে পারে না এবিষয়ে আরো যুক্তি এই যে, ঘট জ্ঞান, পট জ্ঞান ইত্যাদি যদি মনে আশ্রিত হয়ে উৎপন্ন হত, তাহলে এই জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় সম্ভব হত না। কারণ- ন্যায় বৈশেষিক উভয় দর্শনেই মনকে অণু পরিমাণ দ্রব্যরূপে স্বীকার করা হয়েছে। যে দ্রব্য অণুপরিমাণ তার যেমন প্রত্যক্ষ হয় না, তেমনি তাতে স্থিত গুণেরও প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু আমাদের ঘট জ্ঞান, পট জ্ঞান ইত্যাদির মানস প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং মন জ্ঞান গুণের আশ্রয় আত্মা হতে পারে না। তাছাড়া মন আত্মা হলে, মন অণুপরিমাণ হওয়ার জন্য তা শরীরের সর্বাংশে বিদ্যমান না থাকায় সর্বশরীরে কখনই জ্ঞান জন্মাতে পারে না। সুতরাং আত্মাকে হতে হবে সর্বব্যাপী। তাই ন্যায় বৈশেষিকগণ আত্মা আকাশের মত সর্বব্যাপী বলে স্বীকার করেছেন। তাই মন আত্মা নয়।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, ঘট- জ্ঞান ইত্যাদির আশ্রয়রূপে আত্মা নামক কোন স্থায়ী দ্রব্য নেই। এই জ্ঞানগুলি ক্ষণিক অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, এবং দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। প্রত্যেক জ্ঞানই স্বপ্রকাশ অর্থাৎ নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, তখন, ‘স্ব’ বা ‘অহং’ রূপেই প্রকাশ করে। এই ‘অহং’ আকারের জ্ঞানকে বলা হয় আলয়বিজ্ঞান। আলয়বিজ্ঞানের ধারা বা প্রবাহই হল আত্মা।

ন্যায় বৈশেষিকগণ বৌদ্ধদের এই মত মানেননি। তাঁদের মতে, আলয়বিজ্ঞানের ধারাকে আত্মা বললে স্মৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অনুভব কর্তা ও স্মরণ কর্তা অভিন্ন না হলে স্মৃতি হয় না। রাম যা অনুভব করছে, শ্যাম তা স্মরণ করতে পারে না। স্বপ্রকাশ ক্ষণিক বিজ্ঞানই যদি আত্মা হয়, তাহলে অনুভব কর্তা হবে পূর্বের কোন বিজ্ঞান, স্মরণকর্তা হবে পরের কোন বিজ্ঞান কিন্তু তা তো সম্ভব নয়।

বৌদ্ধগণ বলেন, বিজ্ঞান প্রবাহকে আত্মা বললে স্মৃতি হতে কোন বাধা নেই। কারণ, পূর্বের বিজ্ঞান থেকে পরের বিজ্ঞানে বাসনা বা সংস্কারের সংক্রমণ হয় বলেই পরবর্তী বিজ্ঞান পূর্বানুভূত বিষয়কে স্মরণ করতে পারে। প্রথম ক্ষণের বিজ্ঞান দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি সদৃশ আত্মা উৎপাদন করে এবং এভাবেই নব নব আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশের প্রবাহটি চলতে থাকে। পূর্বক্ষণে সৎ অনুভবকর্তা আত্মার অনুভবের ফল যে সংস্কার, সেটি, তার আশ্রয় আত্মা পরক্ষণে বিনষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে, দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন সদৃশ আত্মায় বর্তায় এভাবে, পরবর্তী সকল ক্ষণের বিভিন্ন সদৃশ আত্মায়, এই সংস্কারটি সংক্রামিত হয়। এভাবেই পরক্ষণের আত্মায় পূর্ব পূর্ব সকল ক্ষণের আত্মার অভিজ্ঞতার ফল বর্তায়। যখনই অনুকূল অবস্থার উৎপত্তি হয়, সেই ক্ষণে সৎ আত্মার নিহিত ‘ফল' বা ‘শক্তি 'আত্ম প্রকাশ করে। এভাবেই স্মৃতিজ্ঞান হয়।

ন্যায় দর্শনে বৌদ্ধদের এই মত খন্ডনের উদ্দেশ্যে বলা হয়- বাসনা বা সংস্কার গুণ পদার্থ; তার কোন ক্রিয়া নেই। কাজেই এক বিজ্ঞান থেকে অন্য বিজ্ঞানে বাসনার সংক্রমণ হবে কী করে? পূর্ববিজ্ঞানের দ্বারা উত্তরবিজ্ঞানে

সদৃশ সংস্কারের উৎপত্তিকেও বাসনা সংক্রমণ বলা চলে না। ‘ক’ নামক বিজ্ঞানের অনুভবের সংস্কার কোথায় উৎপন্ন হবে? অনুভব নিজের অধিকরণেই সংস্কার জন্মায় এবং ঐ সংস্কারের দ্বারা স্মৃতির জনক হয়ে থাকে। নিজ অধিকরণ ব্যতীত অন্যত্র ঐ অনুভব সংস্কার উৎপন্ন করে না। কিন্তু বৌদ্ধদার্শনিকদের মতে প্রত্যেকটি বিজ্ঞান ক্ষণিক; কাজেই ঐ বিজ্ঞানরূপ আত্মার অনুভব ঐ বিজ্ঞানে সংস্কার উৎপন্ন করতে পারে না। যদি বলা যায়, অনুভব নিজ অধিকরণে সংস্কার উৎপন্ন না করলেও, পরবর্তী বিজ্ঞানে সংস্কার উৎপন্ন করে, কারণ ঐ বিজ্ঞান তারই কার্য, তাহলেও সে মত গ্রহণ করা যায়না, কারণ, ঐ মত গ্রহণ করলে এক স্মৃতির জন্য অনন্ত সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে এবং তার ফলে গৌরব দোষ হবে। ধরা যাক এইক্ষণে কোন কিছুর অনুভব হল, স্মরণ হচ্ছে বহু বর্ষ পরে। সেক্ষেত্রে স্মরণের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিক্ষণের বিজ্ঞানে ঐ অনুভবের সংস্কারের সদৃশ সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। যদি বলা যায়, প্রত্যেক বিজ্ঞান ব্যক্তিতে ঐ সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকারের প্রয়োজন নেই, কেবল স্মরণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিজ্ঞানে ঐ সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করলেই চলবে, তাহলে সে কথাও যুক্তিসঙ্গত হবেনা। স্মরণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বিজ্ঞানে ঐ সংস্কার উৎপন্ন হবে, অথচ তার পূর্বের কোন বিজ্ঞানে তা উৎপন্ন হবেনা, এমন নিয়মের পক্ষে কোন যুক্তি নেই। অতএব আলয়বিজ্ঞানের প্রবাহকে আত্মা বলা যায় না।

বৌদ্ধ মতে, আত্মা ক্ষণিক ও অনিত্য। কিন্তু ন্যায় দর্শনে চিরস্থায়ী আত্মা স্বীকৃত হয়েছে। বৌদ্ধমত খন্ডনের উদ্দেশ্যে এবং জীবাত্মার নিত্যত্ব সাধনের জন্য মহর্ষি গৌতম বলেছেন-

"পূর্ব্বাভ্যস্ত – স্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষ – ভয় – শোক – সম্প্রতিপত্তেঃ"।

ন্যা. সূঃ ৩/১/১৮

অর্থাৎ নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয় ও শোক দেখে অনুমিত হয় যে, আত্মা নিত্য। কারণ হর্ষ, ভয় ও শোক পূর্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য উৎপন্ন হয়। অভিলাষিত বিষয়ের প্রাপ্তি হলে যে সুখ জন্মায়, তাকে হর্ষ বলে এবং অভিলাষিত বিষয়ের অভাবে বা তা না পাওয়ার জন্য যে দুঃখ জন্মায় তাকে শোক বলে। কিন্তু কোন বিষয়কে নিজের ইষ্টজনক বলে না বুঝলে সে বিষয়ে কারো অভিলাষ বা আকাঙ্খা জন্মাতে পারে না। সুতরাং নবজাত শিশুর ও যে তখন কোন বিষয়ে তার ইষ্টজনক বলে মনে করে সে বিষয়ে অভিলাষী হয় এবং সেটা না পেলে দুঃখ পায় – এটা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু নবজাত শিষুর এইজন্মে তো এরূপ কোন বোধই উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, পূর্ব পূর্ব জন্ম তার ঐরূপ বিষয়কে ইষ্টজনক বলে বোধ হওয়ায় সেই বোধ জন্য সংস্কার বশতঃ এই জন্মে প্রথমে তার সেই বিষয়ের ইষ্টজনক বলে স্মৃতি জন্মায়। সেই স্মৃতিজ্ঞান জন্যই তার সেই বিষয়ে আকাঙ্খা জন্মায়। সুতরাং আত্মা নিত্য।

বৌদ্ধগণ জন্মান্তরবাদ স্বীকার করলেও স্থায়ী নিত্য আত্মা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, কর্মফল জনিত সংস্কার এক ক্ষণিক আত্মা থেকে পরবর্তী ক্ষণিক আত্মাতে বর্তায়। অর্থাৎ একটি 'সন্তান' রূপ মানুষের কর্মের ফল, লৌকিকভাবে কথিত 'মৃত্য'র সঙ্গে সঙ্গে, নতুন যে সন্তান আরম্ভ হয়, তার প্রথম ক্ষণের সন্ততিতে সংক্রামিত হয়। এভাবে, ধারাটি চলতে থাকে এবং পূর্বজন্মের আত্মা রূপ প্রথম সন্তানের পূর্ব পূর্ব ক্ষণের সন্ততির কর্মফল পরপর ক্ষণের সন্ততিতে বর্তায়। এইভাবে, পূর্বজন্মের সন্তানের মধ্য দিয়ে

সংক্রামিত চরিত্র, প্রবণতা বা শক্তির প্রভাবে পরজন্মের সন্তান উৎপন্ন হয়। এবং একটি সন্তানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীকালীন নানা সন্তানের উৎপত্তি ও বিনাশরূপ জন্ম ও জন্মান্তরের প্রবাহটি চলতে থাকে। মানুষ যতকাল নতুন জন্মলাভের বাসনাকে পুরোপুরি জয় করতে না পারে ততকালই এই প্রবাহ চলে।

কিন্তু ন্যায় মতে, সংস্কার গুণ পদার্থ হওয়ায় পূর্ব পূর্ব ক্ষণের সন্ততির কর্মফল জন্য সংস্কার পরক্ষণের সন্ততিতে বর্তাতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে, আত্মা নিত্য। নিত্য আত্মা স্বীকার করেই জন্মান্তরবাদের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব। বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, নবজাত শিশু কখনও মায়ের কোল থেকে একটু সরে গেলেই তখন সে হাত পা ছুড়ে কাঁদে এবং মাকে জড়িয়ে ধরে – এটাই দেখা যায়। শিশু এরূপ করে তার কারণ, যুবক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি ব্যক্তির মত নবজাত শিশুর ও পতনের ভয় আছে। এবং সে পতন নিবারনের জন্যই এরূপ আচরণ করে। পতন যে দুঃখের কারণ, এরূপ বোধ ছাড়া ভয়, দুঃখ এবং পতন থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা উৎপন্ন হতে পারে না। নবজাত শিশুর এই পতন ভয় দেখে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, তার এইরূপ ক্রিয়া পূর্বজন্মকৃত সংস্কার জন্য। তাই আত্মা নিত্য স্বীকার না করলে শিশুর এই সকল ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করা যায় না। সুতরাং আত্মা নিত্য।

তাছাড়া আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে মহর্ষি গৌতম আরো যুক্তি প্রদর্শন করে বলেছেন-

" প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎ স্তন্যাভিলাষাৎ।।" ৩/১/২১

অর্থাৎ নবজাত শিশুর যে প্রথম স্তন্যপানে ইচ্ছা, তা পূর্বজন্মের আহারের অভ্যাস জনিত। সুতরাং শিশুর এই স্তন্যপানের ইচ্ছা প্রমাণ করে আত্মা নিত্য।

অদ্বৈত বেদান্ত ও সাংখ্য মতে শুদ্ধচেতনা বা নির্বিষয়ক জ্ঞানই আত্মা। এই আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা বা ভোক্তা নন।

কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত বা সাংখ্য দার্শনিকদের এই মত খন্ডনের জন্য ন্যায় দর্শনে বলা হয় – জ্ঞান কক্ষনই নির্বিষয়ক হতে পারে না, জ্ঞান সর্বদাই সবিষয়ক হবে। অর্থাৎ জ্ঞান হলে তা ঘট, পট প্রভৃতি কোন বিষয়ের জ্ঞান হবে। এই জ্ঞান গুণ পদার্থ। তাই তা কোন না কোন দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। শুদ্ধচেতনা বা নির্বিষয়ক জ্ঞান আত্মা হতে পারে না। কেননা, যে দ্রব্যকে আশ্রয় করে এই জ্ঞান গুণ থাকে তাই আত্মা।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে আত্মাকে জ্ঞানের অধিকরণ বলা হলেও, আত্মাতে সর্বদা জ্ঞান থাকে না। ন্যায়মতে, জ্ঞান আত্মার আগন্তুক গুণ। আত্মা পূর্বকৃত কর্মবশত দেহের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হলে, আত্মায় জ্ঞান – গুণ উৎপন্ন হতে পারে না। আবার কর্মফল ভোগ শেষ হয়ে গেলে, আত্মা যখন মুক্ত হয়, তখন আত্মা একখন্ড পাথরের মতই জ্ঞানহীন জড়বৎ হয়ে পড়ে। তবে আত্মা জড়বৎ হলেও আত্মাতে চেতন অবস্থান করে। জড়দ্রব্যে কখনই জ্ঞান থাকে না কিন্তু আত্মা অবস্থা বিশেষে জ্ঞান – গুণের আধার হয়।

অনেকে এস্থলে আপত্তি করে বলেন, জ্ঞান আত্মার আগন্তুক গুণ হলে জ্ঞানাশ্রয়ত্ব আত্মার লক্ষণ হয় কীরূপে? কারণ- জ্ঞান তো সর্বদা আত্মাতে থাকে না।

এই আপত্তির উত্তরে বলা হয় – যাতে আত্মত্ব জাতি আছে, তাই আত্মা। আমাদের যে জ্ঞান, তা একটি অনিত্য গুণ। এর একটি সমবায়ি কারণ

অবশ্যই থাকবে। কারণ, অনিত্য ভাব পদার্থ মাত্রই তার সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ থাকবে। এখন, আমাদের অনিত্য জ্ঞানের সমবায়িকারণ যে দ্রব্য, তাতে এমন একটি ধর্ম থাকবে, যার ফলে ঐ দ্রব্য জ্ঞান – গুণের সমবায়িকারণ হতে পেরেছে। এই ধর্ম অন্যান্য দ্রব্যে না থাকায় তারা জ্ঞানের সমবায়িকারণ হতে পারে না। অতএব এই ধর্মই জ্ঞান গুণের সমবায়িকারণের কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম। আত্মত্ব জাতিই হল এই ধর্ম। কাজেই আমরা বলতে পারি যে যাতে আত্মত্ব জাতি আছে, তাই আত্মা।

জৈন দর্শনে আত্মাতে মধ্যম পরিমাণ দ্রব্য বলা হয়েছে আবার রামানুজের দর্শনে আত্মা হল অণু পরিমাণ।

কিন্তু ন্যায় দর্শনে এই উভয় মতকেই খন্ডন করে বলা হয় আত্মা বিভু পরিমাণ বিশিষ্ট। আত্মা যদি মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ শরীর পরিমিত হত, তাহলে আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন বললে, আত্মাকে ঘট, পট ইত্যাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তুর মত অনিত্য বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, মহর্ষি গৌতম নানান যুক্তির দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেছেন। সুতরাং আত্মা মধ্যম পরিমাণ হতে পারে না। আত্মাকে অণু পরিমাণ বিশিষ্ট ও বলা যায় না। কারণ, যা অণু-পরিমাণ বিশিষ্ট, তা সমস্ত শরীরকে ব্যাপ্ত করে থাকতে পারে। কিন্তু আত্মা সমগ্র শরীরকে ব্যাপ্ত করে থাকে। যদি তা না হত তাহলে সমগ্র শরীরের অবয়বে আমরা সুখ দঃখ অনুভব করতে পারতাম না। তাছাড়া আত্মা অণু পরিমাণ হতে সুখ, দুঃখ ইত্যাদি আত্ম গুণের মানস প্রত্যক্ষও সম্ভব হত না। কিন্তু ‘আমি সুখী’, ‘আমি দুঃখী’ এরূপে সুখ, দুঃখের মানস প্রত্যক্ষ আমাদের হয়। সুতরাং আত্মা অণু পরিমাণ বিশিষ্ট নয়। আত্মা হল সর্বব্যাপী বা বিভু পরিমাণ আত্মা সর্বব্যাপী

বিভু বলে সর্বত্র সুখ দুঃখের অনুভব করতে পারে এমন কথা কেহ বলতে পারেন। নৈয়ায়িক মতে বিভু আত্মা শরীরাবচ্ছেদে সুখ দুঃখ ভোগ করে। ফলে আত্মা বিভু পরিমাণ হলেও সর্বত্র সুখ দুঃখ অনুভব করে না। আত্মার ভোগের অধিষ্ঠান হল শরীর। তাই শরীরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মাতেই জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বিশেষ গুণগুলি উৎপন্ন হয়। শরীরের মাধ্যমেই আত্মা সুখ, দুঃখ ভোগ করে। শরীরের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে আত্মা অর্থাৎ মুক্ত আত্মা জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বিরহিত এক অচেতন দ্রব্য।

ন্যায় মতে, আত্মা এক নয় বহু। এখানে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের সাথে ন্যায় দর্শনের পার্থক্য। অদ্বৈত মতে, একই আত্মা সকল দেহে বিদ্যমান। কিন্তু ন্যায় মতে জীবাত্মা বহু। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি আত্মার বিশেষ গুণ হওয়ায় এগুলি যেহেতু একই সময়ে বহু ব্যক্তিতে বহু প্রকারের হয়, তাই আত্মার ভিন্নতা স্বীকার করতেই হয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন যে, স্মরণের দ্বারা আত্মার বিভুত্ব সিদ্ধ হয়। যদি আত্মা এক হত তাহলে একজনের অনুভূত বিষয় অন্যে স্মরণ করতে পারত কিন্তু বাস্তবে আমরা তা করতে পারি না। সুতরাং আত্মা এক নয় বহু। মহর্ষি কণাদ ও আত্মার বহুত্ব সমর্থনে বলেছেন যে, আত্মা এক হলে, কেউ ধণী, কেউ দরিদ্র, কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ, এইরূপ বৈষম্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

এই জীবাত্মার প্রকৃত তাৎপর্য লুকিয়ে রয়েছে মোক্ষ বা মুক্তিতে। বিভিন্ন দর্শনে মুক্তির স্বরূপ ও ভিন্ন ভিন্ন। ন্যায় দর্শনে মহর্ষি গৌতম সমস্ত দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষ অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই অপবর্গ বলেছেন।

"তদত্যন্তবিমোক্ষোহপবর্গঃ।।" ন্যা. সূঃ ১/১/২২

মহর্ষি কণাদ ও আত্মার মুক্তির প্রসঙ্গে বলেন-

"তদভাবে সংযোগাভাবোহপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ।।" বৈ. সূঃ ৫/২/১৮

অর্থাৎ জীবাত্মার ধর্ম ও অধর্মরূপ সমস্ত অদৃষ্টের অভাব প্রযুক্ত তার যে সেই শরীরের সাথে সংযোগের অভাব এবং পুনর্বার অন্য শরীরাদির সঙ্গে সংযোগের যে অনুপপত্তি তাই মোক্ষ বা মুক্তি। বস্তুতঃ জীব জন্ম গ্রহণ করলেই নানা দুঃখ ভোগ অবশ্যম্ভাবী। চিরকালের জন্য আত্মার সাথে শরীরের সম্বন্ধের উচ্ছেদ অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি হলে আর কখন ও সেই মুক্ত আত্মাতে জ্ঞানাদি কোন বিশেষ গুণ জন্মাতে পারে না। তাই সূত্রকার কণাদ আত্মার জ্ঞানাদি সমস্ত বিশেষ গুণের অত্যন্ত উচ্ছেদকেই মুক্তি বলেছেন।[29]

ন্যায় বৈশেষিক মতে, জ্ঞান বা চৈতন্য জীবাত্মার বিশেষ গুণ হওয়ায় তা অনিত্য। ধর্ম ও অধর্ম এবং তার থেকে উৎপন্ন সুখ, দুঃখ ও অনিত্য। সুখের কারণ ধর্ম ও দুঃখের কারণ অধর্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ হলে আত্মাতে আর সুখ, দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে না। কোন জীবাত্মার যখন সমস্ত গুণের উচ্ছেদ হয় তখনই সে স্বস্বরূপ অবস্থান করে। আত্মার এই অবস্থাই মুক্ত অবস্থা।

কিন্তু এখানে আপত্তি হয় যে, মুক্ত অবস্থায় যদি আত্মাতে জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকে তাহলে তা হবে মূর্চ্ছাবস্থার তুল্য। মূর্চ্ছাবস্থা তো পুরুষার্থই হতে পারে না। সুতরাং কোন ব্যক্তিই এই অবস্থা লাভে প্রবৃত্ত হবে না।

[29] ন্যায়পরিচয়, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃঃ ৪-৫।

এর উত্তরে বলা হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই অবস্থা লাভে প্রবৃত্ত হয়। কারণ আমাদের জীবন দুঃখময়। মানুষ যখন দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকে, তখন তার কাছে কষ্টের দুঃখের নিবৃত্তিটাই কাম্য। যদি মূর্চ্ছাবস্থায় সেই দুঃখের নিবৃত্তি হয় তাহলে মূর্চ্ছাবস্থাই তার কাছে কাম্য হয়।

উপসংহার

প্রত্যেকটি দর্শনের আত্মা সম্পর্কিত অভিমত পর্য্যালোচনা করে দেখা গেল যে, এই সব মত গুলির থেকে ন্যায় দর্শনের আত্মাতত্ত্ব স্বতন্ত্র। সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক উপযোগী প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে দর্শন সম্প্রদায়ের মত গুলি আলোচিত হয়েছে তাদের মেলবন্ধন ঘটেছে এই ন্যায় আত্মতত্ত্বে। নৈয়ায়িকরা আত্মাকে যেমন চৈতন্য ভিন্ন সত্ত্বারূপে স্বীকার করেছেন, তেমনি আবার চৈতন্যকেও এর আগন্তুক গুণ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে নৈয়ায়িকরা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাতে চৈতন্য স্বীকার করেছেন, কিন্তু দেহ মুক্ত অর্থাৎ মোক্ষ দশায় আত্মাতে চৈতন্য স্বীকার করেন নি। আত্মার স্বরূপকে এরূপে ব্যাখ্যা করার ফলে ন্যায়সম্মত মুক্তির ধারণা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত হয়ে উঠেছে। ন্যায় দর্শনে মুক্ত আত্মাতে জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি থাকে না বলে, আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় এরূপ অবস্থা আমাদের কাম্য হতে পারে না। কারণ, মানুষ তো সুখ কামনা করে যা জড়ের অবস্থা তা তো কেউ কামনা করতে পারে না। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই আমরা এই বক্তব্যের অসারতা উপলব্ধি করতে পারি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়শই দেখি কোন না কোন কারণবশত মানুষ দুঃখ ভোগ করছে। কোন কোন ব্যক্তির কাছে এই দুঃখ এতটাই অসহ্য ওঠে যে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তাই দুঃখ পীড়িত মানুষের কাছে সুখের তুলনায় দুঃখ নিবৃত্তিটাই বেশী কাম্য। তাই আত্মার স্বরূপ ও তার মুক্তির প্রসঙ্গে ন্যায় সম্মত অভিমতই শ্রেয়।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

- গৌতম, মহর্ষি, *ন্যায়দর্শন* ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য, প্রথমখন্ড, অনু., মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০১১।
- গৌতম, মহর্ষি, *ন্যায়দর্শন* ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য, তৃতীয় খন্ড, অনু, মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০০।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায় পরিচয়,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, নভেম্বর, ২০০৬।
- অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহ,* অনু., শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, আশ্বিন, ১৪১০।
- ভট্টাচার্য্য, করুণা, *ন্যায় বৈশেষিক দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জানুয়ারি, ২০১৩।
- সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, তৃতীয় সংস্করণ, মে, ২০১০।
- চক্রবর্তী, শ্রী সত্যজ্যোতি (অনু.), *সায়ণমাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (প্রথম খন্ড),* সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৮৩।
- চক্রবর্তী, শ্রী সত্যজ্যোতি, *সায়ণমাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড),* সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৬।

- মাধবাচার্য, *সর্বদর্শন সংগ্রহে প্রথমং চার্বাক দর্শনম্*, অনু., শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রিণা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৯৪।
- ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, অনু., শ্রীমৎ- পঞ্চানন ভট্টাচার্য-শাস্ত্রিণা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৭৭।
- কণাদ, মহর্ষি, *বৈশেষিক- দর্শনম্*, অনু., উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫।
- ঈশ্বরকৃষ্ণ, *সাংখ্যকারিকা*, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি, বাচস্পতি মিশ্র, অনু., রজত ভট্টাচার্য্য, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১১।
- মিশ্র, বাচস্পতি, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, কলকাতা, ১৯৮২।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, কনকপ্রভা, *সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জুন, ১৯৯৯।
- কপিল, মহর্ষি, *সাংখ্য দর্শন*, অনু., উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, নবম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৭।
- ভট্টাচার্য, সুখময়, *পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জানুয়ারি, ২০০৬।
- শিবাদিত্য, *সপ্তপদার্থী*, সম্পাদনা, ডঃ জয় ভট্টাচার্য্য, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ২০১০।

- ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, *বেদান্ত পরিভাষা*, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, পঞ্চানন শাস্ত্রী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা ১৩৭৭।
- ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, *বেদান্ত পরিভাষা*, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৯৫ সন।
- ভট্টাচার্য, শ্রী বিধুভূষণ (সপ্ততীর্থ), *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৪।
- শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাক দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৯।
- বাগচী, দীপক কুমার, *ভারতীয় দর্শন*, প্রগতিশীল প্রকাশক, সেপ্টেম্বর, ২০০৮।

ইংরাজী

- Udayanācārya, *Atmatattvaviveka*, Translation, Explanation and Analytical- criticalsurvey by N.S Dravid, publication, Indian Institute of Advanced Study, Shimla, 1995.
- Chatterjee, S.C, Dutta, D.M, *An Introduction to Indian philosophy*, Rupa publication India pvt. ltd. New Delhi, 2007.

- Hiriyanna, M, *Outlines of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass publishers private limited, Delhi, 2005.

সমাপ্ত